পড়াশোনার ক্রোড়পত্র

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৭

উত্তরণ

যুগশঙ্খ-র সঙ্গে ৮ পাতার রঙিন ক্রোড়পত্র

শিক্ষাগুরুর পরামর্শ

সৌমেন দে প্রধান শিক্ষক,
গভঃ মডেল স্কুল, সামসেরগঞ্জ

জানার আগ্রহ নিয়ে পড়তে হবে

মানব উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি শিক্ষা। শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়েই মানবশিশু তার নৈতিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক প্রভৃতি মানোন্নয়নের মাধ্যমে এক শক্তিশালী চরিত্রের অধিকারী হয়ে ওঠে। মাধ্যমিক শিক্ষা একটি শিশুর জীবনে মূল ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে। তাই মাধ্যমিকের ফল আশাপ্রদ হওয়া বাঞ্ছনীয়। মাধ্যমিকে ভালো ফল পাওয়া তখনই সম্ভব, যখন কোনও শিক্ষার্থী তার হাইস্কুলের প্রথমদিন থেকেই সমস্ত বিষয়কে সমান গুরুত্ব দিয়ে পড়বে। হাইস্কুলের প্রারম্ভিক শ্রেণিগুলিতে তাদের অবশ্যই ভাষা ও গণিতের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। প্রতিদিন নিয়ম করে এক থেকে দু'ঘণ্টা গণিত চর্চা করতে হবে। আধুনিক জীবনে ইংরেজি ব্যতীত এককদমও চলা যায় না। সুতরাং ইংরেজি ভাষাচর্চার উপর নজর দিতে হবে। এরজন্য পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি অতিরিক্ত বই পড়তে হবে। নিজেদের মধ্যে ইংরেজিতে কথা বলতে হবে।

যারা আগামিদিনে বিজ্ঞান নিয়ে পড়তে চাও, তাদের উচিত ছোট শ্রেণি থেকেই বিজ্ঞানের খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণ করা। ক্লাস সেভেন ও এইটের বিজ্ঞানের বিষয়গুলি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে পড়তে হবে। ইতিহাস ও ভূগোল এই দুটি বিষয়কেও যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে পড়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

পরিশেষে একটা কথাই বলব যে, সাফল্যের মূল জিয়নকাঠি অনুশীলন। নতুন কিছু জানার আগ্রহ নিয়ে পড়তে হবে। নতুন কিছু পড়ার মধ্যে যে আনন্দ লুকিয়ে আছে, তাকে আবিষ্কার করতে হবে। আর সেটা করতে পারলেই উপযুক্ত লক্ষ্যে পৌঁছনো সম্ভব।

নতুন প্রজন্ম কি অধিক মাত্রায় গৃহশিক্ষক বা কোচিং নির্ভর?

বিপাশা চক্রবর্তী

বর্তমান সময়ে শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে যা প্রতিমুহূর্তে লক্ষণীয়। শুধুমাত্র ভালো রেজাল্টের আশায়, ক্লাসে পাঠ্যবইগুলো পড়া ছাড়া এখনকার পড়ুয়ারা অধিক মাত্রায় সহায়িকা বা কোচিং নির্ভর হয়ে পড়ছে বলেই মনে করছেন অধিকাংশ স্কুল শিক্ষক-শিক্ষিকারা। এখনকার শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য হল পরীক্ষায় শুধু ভালো ফল করা, ক্রমে সেটিই লক্ষ্যে পরিণত হয়ে উঠছে। শিক্ষা মানে যে আত্মার উন্মোচন এক্ষেত্রে সেটি ক্রমশই গৌণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ছে স্কুল পড়ুয়ারা। যারা ক্রমাগত ভালো রেজাল্টের চাহিদা ও প্রতিযোগিতার টানাপোড়েনে পড়ে গিনিপিগের অবস্থায় রয়েছে। যা সমাজের ক্রমশ চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

বর্তমায় সময় দেখা যাচ্ছে, স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষিকারা পড়ানো সত্ত্বেও বেশিরভাগ পড়ুয়ারাই স্কুল ছুটির পর ছুটছে গৃহশিক্ষকদের কাছে বা কোচিং সেন্টারে। স্কুল শিক্ষিকারাও মাঝে মাঝে অভিযোগ করেন ক্লাসে হোমওয়ার্ক দিলেও পড়ুয়ারা সেটা করে আনে না। এর উত্তরও থাকে পড়ুয়াদের কাছে। হোমওয়ার্ক ঠিকমতো না করতে পারার কারণ গৃহশিক্ষিকের বা কোচিংয়ের প্রচুর পড়া থাকে। ফলে সময়ের অভাব সেইসঙ্গে স্কুল ও গৃহশিক্ষিকের পড়া এই দুয়ের মধ্যে পড়ে পড়ুয়াদের একেবারে নাজেহাল অবস্থা। তবে এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে স্কুলশিক্ষকরা একটি সমাধান সূত্র বের করেছেন।

তাঁদের মতে ছাত্রছাত্রীরা প্রতিদিনের পড়া যদি প্রতিদিন করে নেয়, তাহলে তাদের আর কোনও গৃহশিক্ষকের বা কোচিং ক্লাসের প্রয়োজন নেই।

আবার সবসময় যে এই যুক্তি খাটে তাও নয়, কারণ অনেক অভিভাবক আছেন যাঁরা কোনও কারণে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত, তাদের পক্ষে নিজের সন্তানকে পড়াশোনার দিক দিয়ে সাহায্য করা সম্ভব নয়। ফলে সন্তানের ভালোর কথা চিন্তা করেই অভিভাবকরা দৌড়চ্ছেন কোচিং সেন্টারে। পাশাপাশি প্রাইভেট টিউশন নেওয়ার কারণ হিসেবে পড়ুয়ারা অন্য একটা যুক্তি দেখিয়েছে। তাদের যুক্তি হল, *এরপর পরের পাতায়*

জেনারেল নলেজ: সাত ও আটের পাতায় || স্পেশাল টিউশন: তিনের পাতায় || অ্যাডভাইস: ছয়ের পাতায়
ক্লাস সেভেন থেকে টেন-এর টিউশন (ভূগোল): চার ও পাঁচের পাতায় || ক্যুইজ: সাতের পাতায়

উত্তরণ-এর মুখোমুখি: রোল নং ওয়ান

অঙ্কন সেনগুপ্ত নবম শ্রেণি
শান্তিধাম কালীবাড়ি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বঙাইগাঁও, অসম

প্রথমে পড়াটা বুঝে নিই, তারপর লেখার অভ্যাস করি

শান্তিধাম কালীবাড়ি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণি থেকে নবম শ্রেণির পরীক্ষায় ৯৪ শতাংশ নম্বর নিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছে অঙ্কন। অঙ্কে খুব ভালো ফল করেছে সে। মাধ্যমিকে ভালো রেজাল্ট করার বিষয়েও আশাবাদী। পড়াশোনা ছাড়াও আঁকতে ও ক্রিকেট খেলতে ভালোবাসে। বড় হয়ে মানুষের পাশে দাঁড়াতে চায় অঙ্কন। সেই কারণেই চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন দেখে। বাবা এই স্কুলেরই প্রধান শিক্ষক। পড়াশোনায় বাবার অনুপ্রেরণা অঙ্কনের চলার পথের সঙ্গী। এই অনুপ্রেরণা তার কাছে শুধু একজন বাবা হিসেবে নয়, প্রধান শিক্ষক হিসেবেও। এই অনুপ্রেরণা অঙ্কনের জীবনে আশীর্বাদও বটে।

উত্তরণ: তুমি এই স্কুলে কবে থেকে পড়াশোনা করছ?

অঙ্কন: প্রথম শ্রেণি থেকে।

উত্তরণ: কতক্ষণ সময় পড়াশোনা করো?

অঙ্কন: স্কুল ছুটি হয়ে যাওয়ার পর বাড়ি ফিরে এসে একটু বিশ্রাম নিয়ে পড়তে বসি। এরপর প্রায় টানা ৪ থেকে ৫ ঘণ্টা পড়াশোনা করি।

উত্তরণ: বাড়িতে পড়াশোনার ক্ষেত্রে কোনও টিউটরের সাহায্য নাও?

অঙ্কন: হ্যাঁ।

উত্তরণ: কী কী বিষয় টিউশন নাও?

অঙ্কন: অঙ্ক ও ইংরেজি।

উত্তরণ: তোমার প্রিয় বিষয় কী?

অঙ্কন: অঙ্ক।

উত্তরণ: পড়াশোনা মনে রাখার জন্য কী করো?

অঙ্কন: স্কুলে শিক্ষকেরা যেটা পড়ান, সেটা প্রথমে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করি। তারপর বাড়িতে এসে যেটি বুঝেছি সেটিকে লিখে অভ্যাস করি।

উত্তরণ: খেলাধুলা করার সময় পাও?

অঙ্কন: স্কুল ছুটি হওয়ার পর এক ঘণ্টার মতো খেলি।

উত্তরণ: তোমার প্রিয় খেলা কী?

অঙ্কন: ক্রিকেট

উত্তরণ: পড়াশোনার ফাঁকে কী করি?

অঙ্কন: অনেকক্ষণ একটানা পড়ার পর মাঝে মাঝে একটু আঁকি। তারপর আবার পড়তে বসি।

উত্তরণ: তোমার পড়াশোনার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা কে?

অঙ্কন: আমার বাবা-মা। স্কুল শিক্ষকরাও আমার কাছে অনুপ্রেরণা।

উত্তরণ: বড় হয়ে কী হতে চাও?

অঙ্কন: চিকিৎসক।

উত্তরণ: তোমার জীবনের সফলতা কামনা করি।

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৭

নতুন প্রজন্ম কি অধিক মাত্রায় গৃহশিক্ষক বা কোচিং নির্ভর?

প্রথম পাতার পর

ক্লাস চলাকালীন অতি স্বল্প সময়ে শিক্ষিকাদের কাছ থেকে সবসময় কোনও প্রশ্ন থাকলে তা জানা সম্ভব হয়ে ওঠে না, সেক্ষেত্রে তাদের গৃহশিক্ষকের কাছে বা কোচিংয়ের সাহায্য নিতেই হয় বা নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

অপরদিকে যদি বর্তমান সমাজকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিচার করা যায়, সেক্ষেত্রে দেখা যায় এখন পড়াশোনা অনেকটাই রেজাল্ট ভিত্তিক হয়ে গেছে। ভালো ফল করার জন্য বেশিরভাগ অভিভাবকই মনে করে তাদের স্কুলের বাইরে আলাদা করে পঠনপাঠনের প্রয়োজন আছে। যা একমাত্র কোচিং সেন্টার বা গৃহশিক্ষকেরাই এই সমস্যার সমাধান করতে পারেন।

পাশাপাশি যদি গৃহশিক্ষকদের কথা ধরা হয়, তাহলে বলা যায় এর সঙ্গে একটি অর্থনৈতিক দিকের যোগাযোগ রয়েছে। যেমন দেখা যায়, বেশিরভাগ কলেজ পড়ুয়ারা প্রথমে হয়তো তাদের হাতখরচ চালাবার জন্যে এই পেশাটিকে আপন করে নিয়েছেন, পরে সেটিই তাদের কাছে স্থায়ী পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজেই বলা যায়, বর্তমান সময়ে গৃহশিক্ষকের চাহিদা রয়েছে, আগে ছিল না এই রকম কথা ঠিক নয়। পাশাপাশি বলা যায়, গৃহশিক্ষকতা একজন ব্যক্তির জন্য সাময়িক পেশা হলেও এরকম কর্মপ্রার্থীর নিত্যচাহিদা ও জোগান থাকায় এর একটা ধারাবাহিকতা এই সমাজে বরাবর ছিল। এই পেশা আমাদের সামাজিক সংস্কৃতির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। কিন্তু আমাদের দেশে স্কুলশিক্ষা প্রবর্তনের আদিকাল থেকেই গৃহশিক্ষকের ব্যবস্থা ছিল। অনেক গল্প-উপন্যাসেও আমরা গৃহশিক্ষকদের কথা পাই। তাঁরা সাধারণত গ্রাম থেকে শহরে উচ্চশিক্ষার জন্য এসে সম্পন্ন গৃহস্থবাড়িতে থেকে সে বাড়ির ছেলেমেয়েদের পড়ানোর বিনিময়ে থাকা-খাওয়ার সংস্থান করতেন ও নিজের পড়াশোনা চালিয়ে যেতেন। তবে এখানে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু শুধু যে গৃহশিক্ষক তা নয়, সবকিছু ছাপিয়ে রয়েছে আমাদের মূল শিক্ষাব্যবস্থা।

সঙ্গে অনেকক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, স্কুলশিক্ষকেরা স্কুলে পড়ানোর দিকে মনোযোগ না দিয়ে ব্যাচ পড়ানোর দিকে মন দিয়েছেন। কোচিং সেন্টারগুলি শুধুমাত্র পরীক্ষার্থী তৈরি করছে যাতে ভালো রেজাল্ট করা যায়, যেখানে পড়ুয়াদের প্রধান কাজ শুধুমাত্র সাজেশন অনুসরণ করা। কারণ পড়াশোনার ইচ্ছে, জ্ঞানার্জনের আগ্রহ, সেটা আদতে অঙ্কুরেই ঝরে যায়, অবিকশিত থেকে যায়। শুধু কিছু মূল্যের বিনিময় ভালো রেজাল্টের কেনাবেচা চলেছে।

প্রশ্ন এটাই এইভাবে কি আমরা একটি শিক্ষিত জাতি গঠন করতে পারছি যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে? না, আমরা একটি এমন সমাজের জন্ম দিচ্ছি, যেখানে নতুন প্রজন্মের কাছে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের চকচকে ডিগ্রি রয়েছে, কিন্তু যারা শুদ্ধ বাংলা বা ইংরেজি বলতে অক্ষম এমনকী যাদের কাছে নেই জগৎ বিখ্যাত কৃতীদের সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা।

ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদেরই নিতে হবে। তাই জাতি গঠনের আগে আমাদের ঠিক করতে হবে আমরা কি পরীক্ষা পাসের সংকীর্ণ মাপকাঠির ভিত্তিতেই জাতি গঠন করব, নাকি আরও ব্যাপ্ত পরিসরে মানুষকে বিবেচনায় নেব।

শৈশবের জন্য বড়দের কাছ থেকে একটু মায়া, একটু সহানুভূতি, সঠিক পরিকল্পনা চাই। সন্তানরা শুধু ভালো রেজাল্ট করার মেটিরিয়াল নয়, সেটাও আমাদের বুঝতে হবে। এর জন্য শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঠিক করতে হবে। জাতিগতভাবে আমাদের বুঝতে হবে যে পাঠ্যবইয়ের বাছাই অংশের নোট পড়ে শিক্ষিত জাতি গঠন এবং যথার্থ মানুষ তৈরি করা সম্ভব নয়। বরং এই বিকৃত শিক্ষার বাইরে থেকে হয়তো মানুষ হওয়া সম্ভব।

তন্দ্রা সরখেল
(প্রধান শিক্ষিকা):
স্কুলে যদি একজন পড়ুয়া নিয়মিত আসে, শিক্ষিকাদের পড়া মনোযোগ দিয়ে শোনে, অর্থাৎ যেভাবে পড়াশোনা করানো হয়, তা যথেষ্ট। তাই আলাদা করে গৃহশিক্ষকের প্রয়োজন নেই। তবে উঁচু ক্লাসের ক্ষেত্রে বলব, বর্তমানে যে ধরনের সিলেবাস তাতে শিক্ষিকাদের স্কুলের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পড়াতে হয়, সেইসঙ্গে আমাদের সিলেবাস শেষ করার দিক বেশি লক্ষ্য থাকে। তাই সব সময় ক্লাসে প্রশ্নত্তোর করে অভ্যাস করিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। দ্বাদশ শ্রেণির কিছু কিছু বিষয়ের জন্য গৃহশিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা থাকলেও থাকতে পারে তবে দশম শ্রেণি পর্যন্ত স্কুলের পড়ানোই যথেষ্ট।

দীপ্তজিৎ দাস
(গৃহশিক্ষক):
বর্তমানে শিক্ষার গুণগত মান আগের জায়গায় নেই। আজ থেকে ২০-৩০ বছর আগে স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষিকারা যেভাবে পড়াতেন সেটাই এখন প্রশ্নচিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার কারণ হিসেবে বলব, শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে কোটা সিস্টেম চালু হওয়ার জন্য যাঁরা প্রকৃত শিক্ষিত তাঁরা তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি পাচ্ছেন না। যার ফলে পড়ুয়ারা প্রকৃত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সেইসঙ্গে বলব যুগ পালটাচ্ছে, এখন পড়ুয়ারা পড়া ছাড়াও নাচ, গান, আঁকা, সাঁতারের ক্লাস, ফেসবুক, হোয়াটস অ্যাপ এই সমস্ত বিষয়ে বেশি ব্যস্ত। পাঠ্যবই খুঁটিয়ে পড়ার সময় নেই। তাই কোচিংগুলিও তাদের পরীক্ষার জন্য সাজেশন তৈরি করে দিতে ব্যস্ত। কারণ সময়ের অভাব। সেইসঙ্গে রয়েছে অভিভাবকের চাপ। টাকা খরচ করে কোচিং করাচ্ছেন সন্তানকে। তাই তাদের যেভাবেই হোক ভালো রেজাল্ট করতেই হবে। পড়াশোনা এখন অনেকটা রেজাল্ট ভিত্তিক। সেইসঙ্গে রয়েছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি। তাই প্রতিযোগিতাও বেশি। প্রতিটি পরিস্থিতির সঙ্গে প্রতিটি সামাজিক অবস্থা যুক্ত। তাই শুধু গৃহশিক্ষককে কাঠগোড়ায় তুলে কোনও লাভ নেই।

তমাল গঙ্গোপাধ্যায়
(অভিভাবক):
গৃহশিক্ষকের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। বর্তমানে সমাজে এখন বেশিরভাগ বাবা-মা চাকুরিজীবী। তাদের অনেক সময়ে আলাদা করে সন্তানকে পড়ানোর সময় থাকে না। তবে সমাজ সম্পর্কে সচেতন করে তোলা বা একজন ভালো মানুষ হিসেবে তাকে গড়ে তোলার দায়িত্ব রয়েছে একজন অভিভাবকের কাঁধেই। সেটির দায়িত্ব শুধু শিক্ষকদের ওপর ছেড়ে দিলে চলবে না।

বহ্নিশিখা মণ্ডল
(স্কুলছাত্রী):
গৃহশিক্ষকের অবশ্যই প্রয়োজন আছে। স্কুলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমাদের পড়াশোনা করতে হয়। তারপরেও আমাদের অনেক কিছু জানার থাকে, যা অনেক ক্ষেত্রে কম সময়ের মধ্যে জানা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই সেগুলো আরও ভালো করে জানার জন্য গৃহশিক্ষকের কাছে আমাদের যেতে হয়, বা কোচিং ক্লাসের সাহায্য নিতে হয়।

প্রত্যেক স্কুলের ফার্স্টবয় ও ফার্স্টগার্লরা
‘রোল নং ওয়ান’ বিভাগে যোগ দিতে পারো।
ফোন: **033 40605837** (১টা থেকে ৪টে),
ই-মেল: jugasankha.suppli@gmail.com

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৭

স্পেশাল টিউশন: বাংলা ব্যাকরণ

সম্বোধন পদ

আগের টিউশনের পর

সম্বোধন পদ

যে পদ ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কহীন হয়ে কাউকে আহ্বান করতে ব্যবহৃত হয় তাকে সম্বোধন পদ বলে।

বাংলায় সম্বোধন পদ নানা ধরনের হয়। যেমন— হে, ওহে, ওগো, হ্যাঁগো, ওরে ইত্যাদি।

• সম্বোধন পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেখা যায় সাধারণত এই পদটি বাক্যের সঙ্গে সম্পর্কিত না হয়েও বাক্যের প্রথমে বসে। যেমন— কাণ্ডারী! আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তি পণ।

• সম্বোধন পদ শব্দের মাঝে বা শেষেও ব্যবহৃত হয়। যেমন— তুমি ঠাকুর, এর বিহিত করো, সে কথা কি আমি বলেছি, দিদিমণি।

• সম্বোধন পদের পরে অনেক সময় বিশেষ্য পদ ব্যবহার করা হয়। যেমন— ওহে খোকা, এদিকে এসো।

• সম্বোধন পদের পর বহুবচন ব্যবহার করা হয়। যেমন— ওরে, ছেলেরা! এত গোল করছিস কেন?

• সম্বোধন পদ সবসময় শূন্য বিভক্তি হবে এবং এর পরে ছেদ বা যতিচিহ্ন ব্যবহার করা হয়।

সম্বন্ধ ও সম্বোধন পদের তুলনা:

১) সম্বন্ধ পদ ও সম্বোধন পদ দুটিই অ-কারক।

২) সম্বন্ধ পদের সঙ্গে বাক্যের ক্রিয়াপদ ছাড়া যে পদের আগে বসে তার সম্পর্ক থাকে। কিন্তু বাক্যস্থিত কোনও পদের সঙ্গে সম্বোধন পদের সম্পর্ক থাকে না।

৩) সম্বন্ধ পদ সম্পর্কিত বিশেষ্য বা সর্বনামের আগে বসে। সম্বোধন পদ বাক্যের যে কোনও জায়গায় বসে।

৪) সম্বন্ধ পদের সঙ্গে র/এর যুক্ত হয়। সম্বোধন পদের সঙ্গে কোনও বিভক্তি যুক্ত হয় না।

৫) সম্বন্ধ পদের পর কোনও যতিচিহ্ন বসে না। কিন্তু সম্বোধন পদের পর যতিচিহ্ন বসে।

বিভক্তি ও অনুসর্গ:

'পাখি সকালবেলায় গাছের কোটরে বাচ্চাকে খাওয়াচ্ছে।' এই বাক্যে রয়েছে মূল শব্দ পাখি, সকালবেলা, গাছ, কোটর, বাচ্চা এবং ধাতু খাওয়া (খা+ ওয়া)। এখন শুধু এই শব্দসমষ্টি দিয়ে বাক্য হয় না। সেইজন্য বাক্যের সঙ্গে কিছু চিহ্ন যুক্ত হয়েছে। যেমন— পাখি - ০ (শূন্য), সকালবেলা+য়, গাছ+এর, কোটর+এ, বাচ্চা+কে, খাওয়া+চ্ছে। এইভাবে মূল শব্দ বা ধাতুর সঙ্গে যা যুক্ত হয় তাকে বিভক্তি বলে।

যে চিহ্ন বা বর্ণ অথবা বর্ণসমষ্টি শব্দ বা ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে সেগুলিকে পদে পরিণত করে সেগুলিকে বিভক্তি বলে।

বিভক্তি দু'রকমের— শব্দ বিভক্তি এবং ধাতু বিভক্তি।

শব্দ বিভক্তি: পূর্বে প্রদত্ত বাক্যটি থেকে আমরা দেখেছি শব্দের সঙ্গে বিভিন্ন চিহ্ন যুক্ত হয়েছে। ওই বাক্যে যুক্ত হয়েছে 'য়', 'র', 'এ' এবং 'কে'। এই চিহ্নগুলি শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বলে এগুলি শব্দ বিভক্তি। বাংলায় শব্দ বিভক্তি এই পাঁচটি—এ, কে, তে, রে এবং র। অন্যান্য বিভক্তি এইসব বিভক্তি থেকেই জাত। যেমন— 'য়' বিভক্তি 'এ' বিভক্তি থেকে জাত। আবার 'র' বিভক্তির বিকল্প হিসাবেই 'এর' বিভক্তি ব্যবহৃত হয়।

বাক্যের যে পদগুলির সঙ্গে কোনও বিভক্তি চিহ্ন যুক্ত নেই সেগুলি কিন্তু বিভক্তিহীন নয়। কারণ কোনও শব্দ বিভক্তি যুক্ত হয়ে পদে পরিণত না হলে বাক্য গঠিত হয় না। অতএব, এইসব বিভক্তি-চিহ্নহীন পদগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যে বিভক্তি তাকে শূন্য-বিভক্তি বলে।

শব্দ বিভক্তির অন্যতম কাজ হল কারক সম্পর্ক নির্ণয় করা। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝে নেওয়া যাক: সে কলমে বই লিখছে। ভিক্ষুককে পয়সা দাও। মেঘে বৃষ্টি হয়। আজকে যাব।

প্রথম বাক্যে 'লিখছে' ক্রিয়াকে কে, কী এবং কীসের দ্বারা প্রশ্ন করলে উত্তর হবে সে, বই এবং কলমে। এগুলি যথাক্রমে কর্তা, কর্ম এবং করণ সম্পর্ক। এখানে শূন্য বিভক্তি এবং এ-বিভক্তি দিয়ে সম্পর্ক সূচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় বাক্যে 'ভিক্ষুককে' শব্দে নিমিত্ত সম্পর্ক বোঝাচ্ছে। এখানে 'কে' বিভক্তি দিয়ে নিমিত্ত বোঝাচ্ছে।

তৃতীয় বাক্যে 'মেঘে' অর্থাৎ 'মেঘ থেকে' বোঝাতে অপাদান সম্পর্ক হয়েছে। এখানে 'এ' বিভক্তি দিয়ে এই সম্পর্ক প্রকাশ করা হয়েছে।

চতুর্থ বাক্যে 'আজকে' শব্দ দিয়ে অধিকরণ সম্পর্ক বোঝানো হয়েছে। 'কে' বিভক্তি এখানে অধিকরণ সম্পর্ক প্রকাশ করছে।

তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে, শব্দ বিভক্তি কারক সম্পর্ক নির্ণয় করে। আর 'এ' বিভক্তি সমস্ত কারকে ব্যবহৃত হয়। সেজন্য 'এ' বিভক্তিকে বলে তির্যক বিভক্তি। যেমন—

কর্তৃ কারকে: লোকে এই কথা বলে।
কর্ম কারকে: তাকে সবাই মেনে চলে।
করণ কারকে: শিশুরা পেনসিলে লেখে।
নিমিত্ত কারকে: অন্ধজনে দেহ আলো।
অপাদান কারকে: পাপে বিরত হও।
অধিকরণ কারকে: আস্তাবলে ঘোড়া থাকে।

স্পেশাল টিউশন: কম্পিউটার

মাইক্রোসফট এক্সেল

আগের টিউশনের পর

Format-মেনুস্থ বিভিন্ন মেনুর কাজ সমূহ:

Cell-এর কাজ: ওয়ার্কশিটের কোনও সেল এ কোনও সংখ্যা লেখার পর পয়েন্ট অথবা কমা ব্যবহার করতে এই মেনু ব্যবহার করা হয়।

কর্মপদ্ধতি: প্রথমে সেলের লেখাগুলো ব্লক করে নিয়ে তারপর Format > Cell > Custom-এ ক্লিক করে প্রয়োজনমতো কমা অথবা পয়েন্ট বসানো যাবে।

Hide-এর কাজ: ওয়ার্কশিটের কোনও রো গোপন করতে এই মেনু ব্যবহার করা হয়।

কর্মপদ্ধতি: প্রথমে যে রো-গুলো হাইড বা গোপন করতে চাই সেগুলোকে ব্লক করে নিয়ে তারপর Format > Row > Hide > Enter. আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসতে চাইলে Format > Row > Unhide > Enter দিতে হবে।

Colum Autofit Selection-এর কাজ: ওয়ার্কশিটে লেখার পর কোনও কলামকে সংকুচিত করার জন্য এই মেনু ব্যবহার করা হয়।

কর্মপদ্ধতি: ওয়ার্কশিটে লেখার পর কোনও কলামকে সংকুচিত করার জন্য প্রথমে সেই কলামগুলো ব্লক করে নিতে হবে। তারপর Format > Colum > Auto Fit Selection-এ ক্লিক করে কাজটি সম্পন্ন করা যাবে।

Hide-এর কাজ: ওয়ার্কশিটে লেখার পর যদি কোনও কলামকে লুকানোর প্রয়োজন হয় তবে এই মেনু ব্যবহার করে তা করতে হবে।

কর্মপদ্ধতি: ওয়ার্কশিটে লেখার পর কোনও কলামকে লুকানোর জন্য প্রথমে সেই কলামগুলো ব্লক করে নিতে হবে। তারপর Format > Colum > Hide-এ ক্লিক করে কাজটি সম্পন্ন করা যাবে। আবার লুকানো কলামকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে Format > Colum > Unhide-এ ক্লিক করে কাজটি সম্পন্ন করা যাবে।

মাউসের কার্সর বা সেল পয়েন্টার স্থানান্তর করার পদ্ধতি :

ওয়ার্কশিটের বিভিন্ন সেলে গিয়ে ডেটা এন্ট্রি করা বা এডিট করার জন্য কার্সর বা পয়েন্টার স্থানান্তর করতে হয়। কার্সর বা সেল পয়েন্টার একদিক থেকে অন্যদিকে নিয়ে যেতে চাইলে অ্যারো-কি চাপতে হবে। ডানদিকের অ্যারো-কি চাপলে ডানদিকের সেলে যাবে। বাঁদিকের অ্যারো-কি চাপলে বাঁদিকের সেলে যাবে। নীচের দিকের অ্যারো-কি চাপলে নীচের সেলে যাবে। উপরের দিকের অ্যারো-কি চাপলে উপরের সেলে যাবে। Tab ডানদিকের সেলে যাবে। Shift + Tab বাঁদিকের সেলে যাবে। Page Down-একপৃষ্ঠা নীচে যাবে। Page Up- একপৃষ্ঠা উপরে যাবে। Ctrl + Home ওয়ার্কশিটের শুরুতে আসবে। Ctrl + End-ওয়ার্কশিটের শেষে আসবে। Home-প্রথম কলামে (A)আসবে। End + ডানদিকের কি শেষ কলামে (1V)-তে আসবে। End+ নীচের দিকের অ্যারো-কি সবশেষের সারিতে আসবে।

এক্সেল (EXCEL) দিয়ে আমরা কী করতে পারি?

একটি সাধারণ খাতায় পেন/পেনসিল, ইরেজার এবং ক্যালকুলেটর মেশিন দিয়ে যে যে কাজ করা যায় এক্সেলের বিরাট পৃষ্ঠায় আমরা তারচেয়েও অনেক বেশি এবং জটিল কাজ সম্পন্ন করতে পরি।

১) দৈনন্দিন হিসাব সংক্ষরণ ও বিশ্লেষণ করতে পারি।

২) বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে পারি।

৩) বাজেট প্রণয়ন করতে পারি।

৪) ব্যাংক ব্যবস্থাপনার যাবতীয় কাজ করতে পারি।

৫) উৎপাদন ব্যবস্থাপনার কাজ করতে পারি।

৬) আয়কর ও অন্যান্য হিসাবনিকাশ তৈরি করতে পারি।

৭) বৈজ্ঞানিক ক্যালকুলেশন করতে পারি।

৮) বেতন হিসাব তৈরি করতে পারি।

পরিসংখ্যান সূত্র সমূহ:

ওয়ার্কশিটের বিভিন্ন সেলে লিখিত সংখ্যাসমূহের যোগফল, গড়, মোট সংখ্যার সংখ্যা, সর্ববৃহৎ ও সর্বনিম্ন সংখ্যা নির্ণয় ছাড়াও পরিমিত ব্যবধান এবং ভেদাঙ্ক ইত্যাদি পরিসংখ্যানের কাজ করার জন্য কয়েকটি (=) ফাংশন রয়েছে। যেমন: = SUM(List) অংকের এ সূত্রটি দ্বারা কোনও নির্দিষ্ট রেঞ্জের সংখ্যা সমূহের যোগফল নির্ণয় করা হয়। = SUM(List) এখানে List হচ্ছে ভ্যালু যা আমরা যোগ করতে চাই। এই List যদি একাধিক হয় তাহলে আর্গুমেন্ট পৃথককারী চিহ্ন কমা (,) ব্যবহার করতে হয়।

উদাহরণ: সেল পয়েন্টার C8-এ রাখতে = SUM(C2:C7) লিখে এন্টার দিতে হবে

C8 ঘরে মোট যোগফল 3115 আসবে।

= MAX(List) পরিসংখ্যানের এই সূত্রটি দ্বারা নির্দিষ্ট রেঞ্জের সংখ্যাসমূহ হতে Maximum অর্থাৎ সর্ববৃহৎ সংখ্যাটি নির্ণয় করা হয়।

নির্দেশিকা: সেল পয়েন্টার কোনও ফাঁকা সেলে রাখতে হবে।

নির্দেশিকা: =MAX(B2:B5) লিখে এন্টার দিতে হবে।

রেঞ্জের সর্ববৃহৎ সংখ্যা 89423 আসবে।

আবার =MAX(SAL) লিখে এন্টার দিলে একই ফল দেখাবে।

=AVERAGE(List) পরিসংখ্যানের এই সূত্রটি দ্বারা নির্দিষ্ট রেঞ্জের সংখ্যাসমূহের গড় নির্ণয় করা হয়। নির্দেশিকা: সেল পয়েন্টার কোনও ফাঁকা সেলে রাখতে হবে।

=AVERAGE(B2:B5) লিখে এন্টার দিতে হবে।

এটা করলে রেঞ্জের সংখ্যা সমূহের গড় বেরিয়ে আসবে।

=MIN(List) পরিসংখ্যানের এই সূত্রটি দ্বারা নির্দিষ্ট রেঞ্জের সংখ্যাসমূহ থেকে সর্বনিম্ন সংখ্যা নির্ণয় করা হয়। নির্দেশিকা: সেল পয়েন্টার কোনও ফাঁকা সেলে রাখতে হবে।

=MIN(B2:B5) অথবা, =MIN(SAL) লিখে এন্টার দিতে হবে।

রেঞ্জের সংখ্যাসমূহের সর্বনিম্ন সংখ্যাটি বেরিয়ে আসবে।

=COUNT(List) পরিসংখ্যানের এই সূত্রটি দ্বারা নির্দিষ্ট রেঞ্জের মোট সংখ্যা কত তা নির্ণয় করা হয়। নির্দেশিকা: সেল পয়েন্টার কোনও ফাঁকা সেলে রাখতে হবে।

=COUNT (C2:C7) অথবা, =COUNT(SAL) লিখে এন্টার দিতে হবে।

রেঞ্জের মধ্যে মোট সংখ্যা (৬) আছে তা বেরিয়ে আসবে।

=VAR(List) পরিসংখ্যানের এই সূত্রটি দ্বারা কোনও সংখ্যা সমষ্টির ভেদাংক নির্ণয় করা হয়। নির্দেশিকা: টেস্ট স্কোর 500, 510, 550, 515, 505, 535 ইত্যাদি E কলামের E1:E8 রেঞ্জে সংখ্যাসমূহের ভেদাংক নির্ণয় করতে সেল পয়েন্টার E10 অথবা কোনও ফাঁকা সেলে রাখতে হবে।

=VAR(E1:E8) লিখে এন্টার দিতে হবে। ভেদাংক 311.8055 বেরিয়ে আসবে। PV(present Value) পরিসংখ্যানের সূত্রটির সাহায্যে কোনও বিনিয়োগের বর্তমান মূল্য বার করা যায়। *এরপর পরের সপ্তাহে*

স্পেশাল টিউশন ও জেনারেল নলেজ তোমাদের কেমন লাগছে, মেল করে জানাও।

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৭

যুগশঙ্খ SUPPLI team
উত্তরণ
শর্মিলা চন্দ্র (কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর), **তন্ময় মণ্ডল** (সাব-এডিটর),
বিদিশা রায়চৌধুরী (অসম),
সালমা আহমেদ, বিপাশা চক্রবর্তী

ক্লাস সেভেন-এর টিউশন: ভূগোল

এশিয়া মহাদেশ

পৃথিবীর স্থলভাগের তিনভাগের একভাগ জুড়ে আছে বৃহত্তম মহাদেশ এশিয়া। চারটে ইউরোপ বা দেড়খানা আফ্রিকার সমান এই মহাদেশ এতই বিশাল যে, এর পশ্চিম প্রান্তে যখন সূর্য ওঠে, পূর্বপ্রান্তে তখন সূর্যাস্তের সময় হয়ে যায়। সুউচ্চ পর্বতশ্রেণি, বিরাট মালভূমি, বিস্তীর্ণ সমভূমি আর উর্বর নদী উপত্যকার মহাদেশ এশিয়ায় এমন কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে যা অন্য কোনও মহাদেশে নেই। তাই এশিয়াকে 'চরম বৈশিষ্ট্যের মহাদেশ' বলা হয়।

এশিয়া মহাদেশের আয়তন ৪৪,৫৭৯,০০ বর্গকিমি। পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর, পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর, কাস্পিয়ান সাগর, উত্তরে সুমেরু মহাসাগর ও দক্ষিণে ভারত মহাসাগর। এশিয়া এবং ইউরোপ দুটো মহাদেশ 'ইউরেশিয়া' নামক অখন্ড স্থলভাগের অংশ। এশিয়া ও ইউরোপের মাঝে আছে ইউরাল পর্বত এবং ইউরাল নদী। এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশকে আলাদা করেছে সুয়েজ খাল।

জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শিল্প-সংস্কৃতি, জনগোষ্ঠী, জীবনযাত্রার বৈচিত্র্যে অনন্য এই মহাদেশে খ্রিস্টজন্মের ৩৫০০-৫০০০ বছর আগে বড়ো বড় নদীগুলোর উর্বর উপত্যকায় অনেকগুলো নদীমাতৃক সভ্যতার জন্ম হয়েছিল। সিন্ধুনদের ধারে হরপ্পা-মহেঞ্জোদাড়ো ও সিন্ধুসভ্যতার বিকাশ হয়েছিল। তেমনই টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস নদী উপত্যকায় উন্নত মেসোপটেমিয়া, সুমের সভ্যতার উদ্ভব হয়েছিল। হোয়াংহো নদী উপত্যকা ছিল চিন সভ্যতার আঁতুড়ঘর। অতীতকাল থেকে আজও এশিয়া প্রাচ্য সংস্কৃতির ধারক এবং ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ।

পৃথিবীর আর কোনও মহদেশ নেই যার এশিয়া মহাদেশের মতো মাঝখানে এত পাহাড় পর্বতের সমাবেশ। পামীর এবং আর্মেনীয় এই দুটি পর্বতগ্রন্থি থেকে খুব উঁচু উঁচু পর্বতমালা ছড়িয়ে গেছে নানাদিকে। এই পার্বত্য অঞ্চলটি পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর থেকে পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত রয়েছে। হিমালয় ও কুয়েনলুন পর্বতের মাঝখানে আছে তিব্বত মালভূমি। তিব্বতের মালভূমির উত্তর পূর্বদিকে আছে, মঙ্গোলিয়া মালভূমি। পন্টিক ও টরাস পর্বতশ্রেণির মধ্যে আছে আনাতোলিয়া মালভূমি। আনাতোলিয়া মালভূমির দক্ষিণদিক থেকে লোহিত সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত আছে একটি এলাকা যা গ্রস্ত উপত্যকা।

মধ্যভাগের পার্বত্য অঞ্চলের দক্ষিণে বেশ কিছু প্রাচীন মালভূমি আছে যা শক্ত শিলা দিয়ে গঠিত। নদীর প্রবাহ দেখলে বোঝা যায় অঞ্চলটির ঢাল পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে। মধ্যভাগের পার্বত্য অঞ্চলের উত্তরে একটি বড়ো সমতলভূমি আছে। এশিয়ার উত্তরের এই সমভূমি পৃথিবীর বৃহত্তম সমভূমি। সমভূমির মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীগুলির প্রবাহ দেখে বোঝা যায় অঞ্চলটি দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে ঢালু।

তুরানের নিম্নভূমি: উত্তরের সমভূমির দক্ষিণ পশ্চিমে কাস্পিয়ান ও আরল সাগরের চারিদিকে অবস্থিত এই নিম্নভূমি তুরানের নিম্নভূমি নামে পরিচিত।

সাইবেরিয়ার সমভূমি: এশিয়ার উত্তরে ওব, ইনিসি ও লেনা নদীর পলি সঞ্চয়ে এবং হিমবাহের কাজের ফলে এই সমভূমি সৃষ্টি হয়েছে। এই সমভূমিতে মাঝে মাঝে বন্যা হয়।

পূর্বের উচ্চভূমি বা শিল্ড সমভূমি: এই সমভূমির উত্তর-পূর্বদিকে প্রাচীন মালভূমি ক্ষয়ে যাবার ফলে যে সমভূমি সৃষ্টি হয়েছে তাকে পূর্বের উচ্চভূমি বা শিল্ড সমভূমি বলে।

এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ ও পূর্বদিকে কতগুলি নদী আছে ও সেই নদীগুলির পলি দ্বারা কয়েকটি সমভূমি তৈরি হয়েছে। যেমন: ১) উত্তর চিন সমভূমি, ২) সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র সমভূমি, ৩) মেসোপটেমিয়া সমভূমি। এশিয়ার দক্ষিণ ও পূর্বদিকে প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর কতগুলি দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জ আছে। যেমন: ১) জাপানের দ্বীপ সমূহ, ২) ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপসমূহ, ৩) কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জ, ৪) ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ। যে কোনও জায়গার ভূমিরূপের সঙ্গে নদীপ্রবাহের সম্পর্ক থাকে। নদী ভূমির ঢালকে অনুসরণ করে, ভূমির ঢাল যেদিকে নদীও সেদিকে প্রবাহিত হয়। এশিয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায় নদীগুলির অধিকাংশই মাঝখানের পার্বত্য অঞ্চল থেকে উৎপন্ন হয়ে উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্বদিকে চলে গেছে।

জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদ:

সম্পূর্ণ উত্তর গোলার্ধে অবস্থিত এশিয়া মহাদেশের উত্তর-দক্ষিণ এবং পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তার এত বেশি যে, পৃথিবীর প্রায় সব ধরনের জলবায়ু এই মহাদেশে দেখা যায়। কোনও দেশ বা মহাদেশের জলবায়ুর সঙ্গে স্বাভাবিক উদ্ভিদের একটি নিবিড় সম্পর্ক থাকে। জলবায়ুর উপর নির্ভর করে স্বাভাবিক উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য। আবার স্বাভাবিক উদ্ভিদের চরিত্র জলবায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করে। নিরক্ষীয় জলবায়ুতে জন্মায় চিরহরিৎ বা চিরসবুজ উদ্ভিদ। আবার মরু অঞ্চলে জন্মায় কাঁটাজাতীয় উদ্ভিদ।

জলবায়ুর বৈচিত্র্য অনুসারে এশিয়া মহাদেশকে বেশ কয়েকটি জলবায়ু অঞ্চলে ভাগ করা যায়—

১) নিরক্ষীয় জলবায়ু।
২) মৌসুমি জলবায়ু।
৩) চিন দেশীয় জলবায়ু।
৪) ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু।
৫) উষ্ণমরু জলবায়ু।
৬) সাইবেরীয় জলবায়ু।
৭) তুন্দ্রা জলবায়ু।

১) নিরক্ষীয় জলবায়ু: নিরক্ষরেখার কাছাকাছি ১০ ডিগ্রি উত্তর অক্ষরেখা থেকে ১০ ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষরেখার মধ্যে ইন্দোনেশিয়া, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশে নিরক্ষীয় জলবায়ু দেখা যায়।

বৈশিষ্ট্য: সূর্যরশ্মি লম্বভাবে পড়ায় সারা বছর অধিক উষ্ণতা। বার্ষিক গড় উষ্ণতা ২৫ থেকে ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। প্রতিদিন বিকেলে পরিচলন বৃষ্টি হয়। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২০০ থেকে ২৫০ সেমি।

নিরক্ষীয় অঞ্চলে বেশি উষ্ণতা ও বেশি বৃষ্টিপাতের জন্য ঘন চিরহরিৎ বা চিরসবুজ গাছ দেখা যায়। যেমন— মেহগনি, রোজউড, আয়রন উড, সেগুন, আবলুস, রবার, কোকো, সিঙ্কোনা।

ক্লাস এইট-এর টিউশন: ভূগোল

নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চল

নিরক্ষীয় উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু অঞ্চলে সারা বছর অত্যধিক উষ্ণতা আর প্রচুর বৃষ্টিপাতের কারণে গভীর অরণ্য সৃষ্টি হয়েছে। এই কারণে এই অঞ্চলকে নিরক্ষীয় বৃষ্টি অরণ্য অঞ্চল বলা হয়।

নিরক্ষরেখার দু'দিকে সাধারণত ৫ ডিগ্রি থেকে ১০ ডিগ্রি উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত অঞ্চলে এই জলবায়ু দেখা যায়। আফ্রিকার কঙ্গো বা জাইরে নদীর অববাহিকা, দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন নদী অববাহিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন্স, ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ, শ্রীলংকার দক্ষিণ অংশ, কলম্বিয়ার পশ্চিম উপকূল, মাদাগাস্কার পূর্বাংশ, মধ্য আমেরিকার পানামা, কোস্টারিকা, ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের কিছু অঞ্চল এই জলবায়ুর অন্তর্গত।

এই অঞ্চলে সারাবছর সূর্যরশ্মি লম্বভাবে পড়ে বলে দিন বড়, রাত ছোট হয়। ফলে উষ্ণতা সবসময়ই অনেক বেশি। বার্ষিক গড় উষ্ণতা ২৭ ডিগ্রি। সারাবছর উষ্ণ গ্রীষ্মকাল থাকে বলে বার্ষিক উষ্ণতার প্রসার মাত্র ২ ডিগ্রি। দিনেরবেলা সর্বোচ্চ উষ্ণতা ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস এ পৌঁছে যায়। সেইসঙ্গে বাতাসে আর্দ্রতা ও সূর্যরশ্মির প্রখরতাও বেশি থাকে। তবে রাতে উষ্ণতা অনেক কমে যায়, তাই নিরক্ষীয় অঞ্চলে রাত্রি ক্রান্তীয় শীতকাল নামে পরিচিত। একারণে এই জলবায়ু অঞ্চলে বার্ষিক তাপের পার্থক্যের থেকে দৈনিক সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপের পার্থক্য অনেক বেশি। প্রায় ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়।

প্রচন্ড উষ্ণতার কারণে এই অঞ্চলে গভীর নিম্নচাপ অবস্থান করে। এই অঞ্চলে স্থলভাগের থেকে জলভাগের পরিমাণ বেশি হওয়ায় প্রচুর জলীয়বাষ্প বাতাসে মেশে। এই উষ্ণ আর্দ্র বাতাস শীতল ও ঘনীভূত হয়ে পরিচলন প্রক্রিয়ায় প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। সারাবছর ধরে, বছরে অন্তত ২৫০-৩০০ দিন প্রচুর বৃষ্টি হলেও কোনও কোনও অঞ্চলে বছরে দু'বার বেশি ও কম বৃষ্টিপাত লক্ষ করা যায়। এই অঞ্চলে প্রতিদিন সকালে আকাশ পরিষ্কার থাকে। বিকেলের দিকে ঘন কিউমুলোনিম্বাস মেঘে ঢেকে যায়। বজ্র বিদ্যুৎসহ প্রবল ঝড়বৃষ্টি হয়, আবার রাত্রিবেলা আকাশ মেঘমুক্ত হয়ে তাপমাত্রা কিছুটা কমে যায়। এই জলবায়ু অঞ্চল নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয়, আন্তঃক্রান্তীয় অভিসরণ অঞ্চল দ্বারা প্রভাবিত।

এই অরণ্যে সারাবছর গাছে সবুজ পাতা থাকে, ফুল ফোটে, ফল ধরে তাই একে চিরসবুজ অরণ্য বলা হয়। ব্রাজিলের আমাজন নদী অববাহিকায় এই ক্রান্তীয় অরণ্য সেলভা নামে পরিচিত। এই অরণ্যে রবার, রোজউড, ব্রাজিল নাট, আয়রন উড, বাঁশগাছ দেখা যায়। জাইরে নদী অববাহিকায় নিরক্ষীয় অরণ্যে মেহগনি, রবার, পাম, কোকো, সিঙ্কোনা গাছের প্রাধান্য দেখা যায়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নিরক্ষীয় অরণ্যে শাল, সেগুন, আবলুস, রবার গাছ দেখা যায়। উপকূল অঞ্চলে প্রচুর নারকেল, তালগাছ জন্মায়।

এই অরণ্যে নানা প্রজাতির গাছ পাশাপাশি জন্মায়। ব্রাজিলের বৃষ্টি অরণ্যে ২ বর্গকিমিতে প্রায় ৩০০ প্রজাতির গাছ দেখা যায়। পৃথিবীর আর কোনও অরণ্যে এত প্রজাতির গাছ দেখা যায় না। গাছগুলোর কাঠ শক্ত ও ভারী, গুঁড়ি খুব লম্বা, মোটা আর পাতাগুলো বেশ চওড়া হয়। গাছগুলো এমন ঠাসাঠাসি ভাবে থাকে যে, অরণ্যের ওপর চাঁদোয়ার মতো ঢেকে যায়। এর মধ্য দিয়ে সূর্যের আলো অরণ্যের তলদেশে পৌঁছতে পারে না। ফলে স্যাঁতসেঁতে, অন্ধকার তলদেশে নানা লতা, গুল্ম, পরগাছা গজিয়ে দুর্গম হয়ে ওঠে।

ঘন ও দুর্ভেদ্য অরণ্যে, গাছে চড়তে পারে এমন পশুপাখি, জীবজন্তুর আধিক্য দেখা যায়। বাঁদর, গরিলা, শিম্পাঞ্জি, ওরাংওটাং, বিভিন্নরকম সাপ, পাখি, বিষাক্ত কীটপতঙ্গ দেখা যায়। অরণ্যের তলদেশে হরিণ, গন্ডার, হাতি, জেব্রা ও নদী জলাশয়ে প্রচুর কুমির, জলহস্তী আছে।

উষ্ণ আর্দ্র অস্বাস্থ্যকর জলবায়ু, বিপদসংকুল বন্য পরিবেশে জনবসতি বিরল। জাইরে ও আমাজন অববাহিকার তুলনায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নিরক্ষীয় অঞ্চলে লোকবসতি বেশি। জাইরে অববাহিকায় পিগমি, উচ্চ আমাজন অববাহিকার রেড ইন্ডিয়ান ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সেমাঙ ও অন্যান্য উপজাতির মানুষরা এই অঞ্চলের প্রধান অধিবাসী। বনের ফলমূল, বনজসম্পদ সংগ্রহ ও পশুশিকার অধিবাসীদের প্রধান জীবিকা। বর্তমানে অরণ্যের কাছাকাছি অঞ্চলে আদিম প্রথায় স্থানান্তর কৃষির মাধ্যমে ভুট্টা, মিষ্টি আলু, ওল, কলার চাষ হচ্ছে। কোথাও কোথাও স্থায়ীভাবে কৃষিকাজ করার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে।

অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে উপনিবেশ স্থাপন করে ইউরোপীয় বণিকরা এই অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় বাগিচা কৃষি শুরু করেছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালয়, জাভা, সুমাত্রায় রবার চাষ, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে আখ, কলার চাষ, আফ্রিকার গিনি উপকূলে কোকো ও তাল জাতীয় গাছের তেল উৎপাদন করে অধিবাসীরা জীবিকা নির্বাহ করে।

মালয়-এ টিন, সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিও-য় প্রচুর খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যায়। প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অভাবে ভারী শিল্প গড়ে ওঠেনি। তবে স্থানীয় কৃষিজ, বনজ ও খনিজ দ্রব্যের ওপর নির্ভর করে কিছু শিল্প গড়ে উঠেছে।

অস্বাস্থ্যকর জলবায়ু, দুর্গম জঙ্গল, বিষাক্ত কীটপতঙ্গের উপদ্রব, ম্যালেরিয়া-কালাজ্বরের প্রাদুর্ভাব— সবই এখানকার অর্থনৈতিক উন্নতির অন্তরায়। কিন্তু বর্তমানে অতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এই অঞ্চলে নতুন জনবসতি গড়ে উঠছে। ক্রমাগত চাহিদায়, বসতি, কৃষি, শিল্প, পরিবহণের প্রয়োজনে প্রতিদিন বিরাট এলাকার বৃষ্টি অরণ্য ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

যুগশঙ্খ
SUPPLI
মঙ্গলবার, ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৭

ক্লাস নাইন-এর টিউশন: ভূগোল

পশ্চিমবঙ্গ

উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে বাংলা বলতে বোঝাত অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গআআ অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশ,অসম, বিহার ও ওড়িশাকে। ১৮৭৪ সালে অসম এবং ১৯১১ সালে বিহার ও ওড়িশা বাংলা থেকে আলাদা হয়ে যায়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট অবিভক্ত বাংলার পশ্চিমাংশ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ গঠিত হয়। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে রাজন্যবর্গ শাসিত দেশীয় রাজ্য কোচবিহার এবং ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি উপনিবেশ চন্দননগর পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের সুবাদে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হয় বিহারের মানভূম জেলার পুরুলিয়া মহকুমা এবং পূর্ণিয়া জেলার কিষাণগঞ্জ মহকুমা। এইভাবে নানা রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অঙ্গরাজ্য হিসাবে গড়ে উঠেছে।

পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে আছে প্রতিবেশী রাজ্য সিকিম ও প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভুটান। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ এবং প্রতিবেশি রাজ্য মেঘালয় ও অসম। পশ্চিমে আছে প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপাল এবং প্রতিবেশী রাজ্য বিহার ও ওড়িশা।

ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে ভারতের পূর্বভাগে পশ্চিমবঙ্গের ওপর দিয়েই উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে যাবতীয় যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা ত্বরান্বিত হয়েছে। উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্য যেমন, অসম, মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরা প্রভৃতির সঙ্গে জলপথে বিদেশে পণ্য বিনিময়ের কোনও সুযোগ নেই কারণ রাজ্যগুলি স্থলবেষ্টিত। তাই এদের পশ্চিমবঙ্গের বন্দর ব্যবহার করেই সমুদ্রপথে পণ্য আমদানি ও রফতানি করতে হয়। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপাল, ভুটান এবং প্রতিবেশী রাজ্য বিহার ও ঝাড়খণ্ডের কোনও সমুদ্র উপকূল না থাকায় পণ্য আমদানি ও রফতানির জন্য পশ্চিমবঙ্গের বন্দর ব্যবহার করতে হয়। কারণ পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা হল এই রাজ্য ও রাষ্ট্রগুলোর নিকটতম বন্দর। অবস্থানগত দিক থেকে এই রাজ্য সুবিধাজনক স্থানে অবস্থিত হওয়ায় প্রতিবেশী দেশ ও রাজ্যগুলো অনেকাংশে পশ্চিমবঙ্গের ওপর নির্ভরশীল। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেশী দেশ:

নেপাল: নেপালের উত্তরে চিন, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমে ভারতবর্ষ। নেপালের আয়তন ১ লক্ষ ৪৫ হাজার, ৩৯১ বর্গকিলোমিটার। পার্বত্য দেশ নেপালে হিমালয়ের উচ্চতম শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট এবং ধবলগিরি, মাকালু, গৌরিশংকর প্রভৃতি শৃঙ্গ অবস্থিত। সমগ্র অঞ্চল দক্ষিণে ঢালু।

নেপালের দীর্ঘতম নদী কালীগন্ডক। অন্যান্য নদী হল বাগমতী, কালী, সেতি। বর্ষাকালে বৃষ্টি হয়। শীতকালে তুষারপাত হয়। এখানে শাল, সেগুন, বাঁশ, বেত, ওক, ম্যাপল, পাইন, ফার প্রভৃতি উদ্ভিদ জন্মায়। নেপালে ধান, পাট, আখ, তামাক, ডাল, গম, ভুট্টা, কলা, আনারস ও কমলালেবু জন্মায়। এখানে তামা, দস্তা, লোহা, সোনা, সিসা, গ্রাফাইট,

চুনাপাথর পাওয়া যায়। পাট, চিনি, সিমেন্ট শিল্পের পাশাপাশি এই দেশে বিভিন্ন কুটির শিল্প গড়ে উঠেছে। কাঠমান্ডু নেপালের রাজধানী ও প্রধান শহর। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য শহর হল পোখরা, কপিলাবস্তু, বিরাটনগর, বীরগঞ্জ ও জনকপুর।

ভুটান: ভুটানের উত্তরে চিন এবং দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমে ভারত। ভুটানের আয়তন প্রায় ৪৭ হাজার বর্গকিলোমিটার। পার্বত্য দেশ ভুটানের উচ্চতম শৃঙ্গ কুলাকাংরি। সমগ্র ভূভাগ দক্ষিণে ঢালু। মানস ভুটানের দীর্ঘতম নদী। অন্যান্য নদী হল তোর্সা, রায়ডাক ও সঙ্কোশ। বর্ষাকালে বৃষ্টি হয়। উত্তরাংশে বৃষ্টিপাত কম কিন্তু শীত বেশি। উঁচু অংশে তুষারপাত হয়। শাল, সেগুন, গর্জন, ওকে, ম্যাপল, পাইন, ফার, সিডার হল স্বাভাবিক উদ্ভিদ। ধান, গম, বার্লি, আলু, এলাচ, আপেল ও কমলালেবুর চাষ হয়। এই দেশে ডলোমাইট, কয়লা, জিপসাম, গ্রাফাইট প্রভৃতি খনিজ পাওয়া যায়। বর্তমানে ভুটানে দেশলাই ও সিমেন্ট শিল্প গড়ে উঠেছে।তাছাড়া বাঁশ, বেত, কাঠের কাজ, পশমের জিনিস এবং ফল সংরক্ষণ শিল্পও স্থাপিত হয়েছে। থিম্পু ভুটানের রাজধানী ও প্রধান শহর। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য শহর হল ফুন্টশোলিং, পুনাখা, পারো।

বাংলাদেশ: বাংলাদেশের উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম ভারত এবং দক্ষিণ পূর্বে মায়ানমার এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। বাংলাদেশের আয়তন ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৭৩ বর্গকিলোমিটার। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্বের কিছু অংশ পার্বত্য ভূমি এবং বাকি অংশ সমভূমি। এখানকার উচ্চতম শৃঙ্গ কেওক্রাডাং। পদ্মা বাংলাদেশের প্রধান নদী। অন্যান্য নদীর মধ্যে মেঘনা, যমুনা, কর্ণফুলি, ফেনি, বুড়িগঙ্গা, মধুমতী, শীতলাক্ষা, কপোতাক্ষ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বর্ষাকালে এই দেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। শীতকাল শুষ্ক। পার্বত্য অঞ্চলে জারুল, গর্জন, গেঁওয়া, কেওড়া, হোগলা, গোলপাতা প্রভৃতি উদ্ভিদ জন্মায়। ধান, পাট, আখ, ডাল, তৈলবীজ, গম, চা, কমলালেবু প্রভৃতির চাষ হয়। এই দেশে প্রাকৃতিক গ্যাস, চুনাপাথর, সামান্য কয়লা ও লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। এখানে পাট, চিনি, কাগজ, সিমেন্ট, বস্ত্র প্রভৃতি কৃষি নির্ভর শিল্প গড়ে উঠেছে। ঢাকা বাংলাদেশের প্রধান শহর ও রাজধানী। এছাড়া চট্টগ্রাম, রাজশাহি, খুলনা, কুষ্ঠিয়া, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি অন্যান্য উল্লেখযোগ্য শহর।

ক্লাস টেন-এর টিউশন: ভূগোল

ভারতের ভূপ্রকৃতি

আমরা আমাদের চারপাশে তাকালে প্রকৃতির রূপের অনেক বৈচিত্র্য দেখতে পাই। কোথাও উঁচু পর্বতমালা, কোথাও মাইলের পর মাইল বালি দিয়ে ঘেরা মরুভূমি। কোথাও মাঝারি উঁচু টিলা, আবার কোথাও দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ সমভূমি। এগুলিকে এককথায় বলা যায় ভূপ্রকৃতি। আমাদের দেশে সব ধরনের ভূপ্রাকৃতিক বৈচিত্র্য দেখা যায় যা যে কোনও মহাদেশের ভূপ্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের সঙ্গে তুলনা করা যায়।

ভারতের ভূপ্রকৃতিকে প্রধান পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়। যথা— ১) উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল, ২) উত্তরের সমভূমি অঞ্চল, ৩) উপদ্বীপীয় মালভূমি অঞ্চল, ৪) উপকূলীয় সমভূমি অঞ্চল, ৫) দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জ।

উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল: উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত সুবিশাল হিমালয়, লাদাখ ও কারাকোরাম পর্বত নিয়ে গঠিত। হিমালয়ের এই বিশাল ব্যাপ্তির জন্য উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলকে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলও বলা হয়। পৃথিবীর উচ্চতম এই নবীন ভঙ্গিল পর্বতটি ভারতের উত্তর পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রসারিত। উত্তর-পশ্চিমে পামীর গ্রন্থি থেকে এই পর্বত দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ধনুকের মতো বাঁক নিয়ে প্রসারিত হয়েছে। হিমালয়ের পশ্চিমে নাঙ্গা পর্বত থেকে পূর্বে নামচাবারওয়া পর্যন্ত দৈর্ঘ্য বরাবর ২৪০০ কিলোমিটার এবং উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রস্থ বরাবর ২০০ থেকে ৫০০ কিলোমিটার বিস্তৃত।

প্রস্থ বরাবর হিমালয়ের ভূপ্রকৃতি: সৃষ্টির শুরু থেকে হিমালয় পর্বতে তিনবার প্রবল আলোড়নে টেথিসের পলিতে যেমন যেমন পর্যায়ে ভাঁজ পড়েছে, পর্বতের বিভিন্ন অংশ তেমনভাবে বিভিন্ন উচ্চতায় উত্থিত হয়েছে। উচ্চতা অনুসারে হিমালয় পর্বতকে উত্তর থেকে দক্ষিণে অর্থাৎ আড়াআড়ি ভাবে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন— শিবালিক হিমালয়, হিমাচল হিমালয়, হিমাদ্রি হিমালয় এবং টেথিস হিমালয়। এর মধ্যে টেথিস হিমালয়ের অংশটি ভারতবর্ষের পরিসীমার

বাইরে তিব্বতে অবস্থিত।

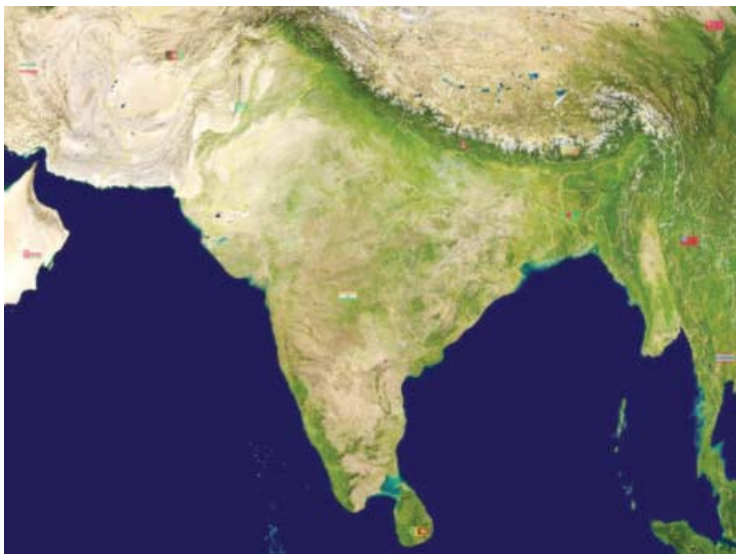

১) শিবালিক বা বহিঃহিমালয়: হিমালয়ের দক্ষিণ প্রান্তে জম্মু-কাশ্মীরের দক্ষিণাংশ, হরিয়ানা, উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশ, অরুণাচল প্রদেশ, মেঘালয় রাজ্যে শিবালিম বিস্তৃত। এর দৈর্ঘ্য ২৪০০ কিমি, প্রস্থ পশ্চিম প্রান্তে ৫০ কিমি এবং পূর্ব প্রান্তে ১৫ কিমি। গড় উচ্চতা ৬০০-১৫০০ মিটার। ২০ লক্ষ থেকে ২ কোটি বছর আগে শেষ বা তৃতীয় ভূ-আন্দোলনের সময় এটি সৃষ্টি হয়েছিল। এটি হিমালয়ের নবীনতম অংশ। পশ্চিমবঙ্গে শিবালিক পর্বতে তিস্তা নদীর এবং রায়ডাক নদীর উপত্যকা অংশে ৮০-৯০ কিমির একটি ফাঁক দেখা যায়। এই অংশের উত্তরে কয়েকটি উপত্যকা সৃষ্টি হয়েছে। উত্তরাখণ্ডে এগুলি দুন নামে পরিচিত। যেমন— দেরাদুন, কোটাদুন, পাটলিদুন প্রভৃতি।

২) হিমাচল বা মধ্য হিমালয়: শিবালিকের উত্তরে জম্মু ও কাশ্মীরের মধ্যভাগে, উত্তরাখণ্ডের উত্তরাংশে বিস্তৃত। এর দৈর্ঘ্য ২৪০০ কিমি। প্রস্থ গড়ে ৬০ থেকে ৮০ কিমি। গড় উচ্চতা ৩৫০০-৪৫০০ মিটার। ২.৫ থেকে ৩.৫ কোটি বছর আগে দ্বিতীয় ভূ-আলোড়নের সময় এটি সৃষ্টি হয়েছিল। মৃদু উত্তরমুখী ঢাল ও খাড়া দক্ষিণামুখী ঢালের অস্তিত্ব এখানে লক্ষণীয়। এর ফলে হিমাচল হিমালয় শূকরপৃষ্ঠ ভূমিরূপের ন্যায় দেখতে হয়। প্রধান পর্বতশ্রেণী হল পিরপাঞ্জাল, ধাওলাধর, মুসৌরি, নাগটিব্বা। পিরপাঞ্জাল ও জাস্কার পর্বতের মাঝে কাশ্মীর উপত্যকা, কুলু ও কাংড়া উপত্যকা অবস্থিত। এখানকার প্রধান গিরিপথ পিরপাঞ্জাল, বানিহাল, রোটাং। এখানকার প্রধান হ্রদ সাততাল, নৈনিতাল, ভীমতাল।

৩) হিমাদ্রি বা প্রধান হিমালয়: হিমাচলের উত্তরে ভারতের উত্তর প্রান্ত ও জম্মু-কাশ্মীরের উত্তরাংশ বরাবর এই হিমালয় বিস্তৃত। এর দৈর্ঘ্য ২৪০০ কিমি, প্রস্থ গড়ে ২৫ কিমি, গড় উচ্চতা ৬১০০ মিটার। এটি হিমালয়ের সবচেয়ে উঁচু অংশ। ৭ কোটি বছর আগে ইওসিন যুগে প্রথম ভূ-আলোড়নের সময় এটি সৃষ্টি হয়েছিল। পৃথিবীর উচ্চতম শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট এখানে অবস্থিত। এছাড়া কাঞ্চনজঙ্ঘা, মাকালু, ধবলগিরি, অন্নপূর্ণা, কেদারনাথ, নন্দাদেবী, কামেট প্রভৃতি শৃঙ্গ অবস্থিত। প্রধান গিরিপথগুলি হল জেলেপলা, নাথুলা, বুর্জিলা, সিপকিলা।

৪) টেথিস হিমালয়: প্রধান হিমালয়ের উত্তরে জম্মু-কাশ্মীরের উত্তরাংশ ও হিমাচল প্রদেশের সামান্য অংশে এই হিমালয় বিস্তৃত। এর দৈর্ঘ্য ভারতে প্রায় ১০০০ কিমি, প্রস্থ ৪০-২২৫ কিমি। গড় উচ্চতা ৩০০০ মিটার। এই হিমালয়ের উত্থান শুরু ১২ কোটি বছর আগে। এর প্রধান শৃঙ্গ গডউইন অস্টিন। উচ্চতা ৮৬১১ মিটার। এটি ভারতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। এই পর্বতকে বসুধা বা ধবলশীর্ষ বলা হয়।

দৈর্ঘ্য বরাবর শ্রেণিবিভাগ: হিমালয় পর্বতমালাকে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। ১) পশ্চিম হিমালয়, ২) মধ্য হিমালয়, ৩) পূর্ব হিমালয়।

১) পশ্চিম হিমালয়: হিমালয় পর্বতমালার একেবারে পশ্চিমাংশে বা বাঁদিকের অংশ হল পশ্চিম হিমালয়, যা পশ্চিমে সিন্ধু নদী উপত্যকা থেকে পূর্বে কালী নদীর উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত। এটি প্রায় ৮৮০ কিমি বিস্তৃত। পশ্চিম হিমালয় তিনটি অংশে বিভক্ত। যথা— ১) কাশ্মীর হিমালয়, ২) পঞ্জাব ও হিমাচল হিমালয়, ৩) কুমায়ুন হিমালয়।

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৭

ভালো ফলাফল করতে হলে...

ছাত্রজীবনে ভালো ফলাফল করতে হলে সঠিক নিয়মে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়। শুধু বইপত্র খুলে পড়েই চললাম সেটাই কিন্তু নিয়ম নয়। পড়াশোনার ব্যাপারে অবশ্যই কিছু কৌশল ও নিয়ম মেনে চলতে হবে। সবসময় মেধাবী ছাত্র হলেই ভালো ছাত্র হয় না আবার অনেক কম মেধাবী ছাত্রছাত্রীরাও শুধু নিয়ম মেনে পড়াশোনা করে ভালো জায়গায় পৌঁছতে পারবে।

পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতে হলে সবার আগে ভাষার উপর দক্ষতা অর্জন করতে হবে। বাংলা ও ইংরেজিতে দক্ষ হতে হবে। এই দক্ষতা অর্জনের জন্য অবশ্যই গ্রামারের দিকে বেশি লক্ষ রাখতে হবে। ছাত্রছাত্রীরা গ্রামারে দুর্বল হলে ভাষার উপরেও নিজের দখল রাখতে পারবে না। এই সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য একজন ভালো শিক্ষকের পরামর্শ নিতে হবে এবং নিয়মিত চর্চা চালিয়ে যেতে হবে। নির্ভুল বানান, সুন্দর ও ঝকঝকে খাতা অবশ্যই মূল্যায়নে বিশেষ প্রভাব রাখবে।

জীবনের যে কোনও কাজের মতোই পড়াশোনায় সাফল্য পেতে গেলে তার পিছনে লেগে থাকতেই হবে। পড়াসংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে হবে এবং কীভাবে তার সমাধান করা যাবে সে ব্যাপারে সচেতন হতে হবে।

প্রতিটি বিষয় বুঝে পড়তে হবে। কারণ, বারবার অমনোযোগী হয়ে পড়ার চেয়ে একবার বুঝে পড়া ভালো আর সবথেকে ভালো হল পড়ার পর সেটা লেখা।

পড়া-সংক্রান্ত যে কোনও ব্যাপারে নিজের শিক্ষকদের উপদেশ মেনে চলতে হবে কারণ বাবা-মায়ের পর শিক্ষকই সেই গুরুজন এবং অভিজ্ঞব্যক্তি যিনি জানেন কীভাবে লেখাপড়া করলে সাফল্য পাওয়া যাবে।

লেখাপড়া সহজভাবে মনে রাখা এবং দীর্ঘস্থায়ী করার একটি পরীক্ষিত পদ্ধতি হল গ্রুপ স্টাডি বা দলগতভাবে লেখাপড়া করা। একে ডিসকাস থেরাপিও বলা হয়। লেখাপড়ায় সফলতা অর্জনের জন্য এই পদ্ধতি খুবই কার্যকর। সহপাঠীদের সঙ্গে দলবদ্ধ হয়ে যে কোনও কঠিন বিষয় সহজেই আয়ত্ত করতে পারা যায়।

ভালো ফল করার জন্য প্রয়োজন ভালো মানের বই, ভালো নোটস। উন্নত নোট সংগ্রহের জন্য শিক্ষকের গাইডলাইন, ভালো বই ও ভালো ছাত্রছাত্রীদের নোট সংগ্রহ করে পড়া যেতে পারে।

প্রতিটি বিষয় বুঝে পড়তে হবে। কারণ, বারবার অমনোযোগী হয়ে পড়ার চেয়ে একবার বুঝে পড়া ভালো আর সবথেকে ভালো হল পড়ার পর সেটা লেখা।

সবসময় জীবন সম্পর্কে ইতিবাচক চিন্তাভাবনা করতে হবে। এক-আধবার খারাপ ফল করলে হতাশ হওয়ার বা ভেঙে পড়ার কিছু নেই। ইতিবাচক চিন্তা সমস্যার সমাধান করে দেয় তাই হতাশ না হয়ে, সবসময় ইতিবাচক চিন্তা করতে হবে। বিশৃঙ্খল জীবনযাপনে কখনও সফলতা আসে না। তাই সুনির্দিষ্ট রুটিন তৈরি করে সেই অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে হবে। রুটিন কয়েক ধরনের হতে পারে, যেমন— স্কুলের রুটিন, গৃহশিক্ষকের রুটিন, বাড়িতে পড়ার রুটিন, খেলাধুলার রুটিন, অবসরকালীন পড়ার রুটিন ইত্যাদ। টিচার যে পড়াটি পড়াবেন তা আগেই দেখে রাখলে, টিচারের পড়া সহজেই বুঝতে পারবে। এটি একটি অসাধারণ কৌশল। বিশেষ করে যারা অনেক ছাত্রছাত্রীর মাঝে পড়া বুঝতে পারে না কিংবা দুর্বল, তাদের অবশ্যই এ কৌশল অবলম্বন করা উচিত।

নিজেকেই নিজের পরীক্ষক ভেবে নিয়ে বাড়িতে নিজে নিজেই পরীক্ষা দিতে হবে। এটিকে পরীক্ষার মহড়াও বলা যেতে পারে। খেয়াল রাখতে হবে সব বিষয়ে যেন ভালো প্রস্তুতি থাকে। প্রস্তুতি সন্তোষজনক হলে পরীক্ষাও ভালো হয়।

সবাই এখন ইংরেজি আর অঙ্কে বেশি নম্বর পাওয়ার চিন্তায় অন্যান্য বিষয়গুলির উপর নজর কম দেয়। কিন্তু তা করলেও চলবে না। প্রতিটি বিষয়ের উপরেই সমান নজর দিতে হবে। আরও একটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে সেটি হল সুন্দর হাতের লেখা। সুন্দর হাতের লেখার সবসময় প্রশংসনীয়। লেখা সুন্দর হলে পরীক্ষক ধরে নেন এটি একটি ভালো ছাত্রের খাতা। শিক্ষাক্ষেত্রের সকল স্তরেই হাতের লেখার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। হাতের লেখা সুন্দর ও দ্রুত করার জন্য সুন্দর কোনও হাতের লেখা অনুসরণ করতে পার। এছাড়া এই ব্যাপারে কারও পরামর্শও নেওয়া যেতে পারে।

সন্তানকে মানুষ করুন সঠিক পথে

একজন অভিভাবকের কাছে তার সন্তান সব সময় স্নেহের পাত্র। মাঝে মাঝে এই স্নেহ বা ভালোবাসা এতটাই হয়ে যায়, যে তা অনেক সময় মাত্রাতিরিক্ত হয়ে দাঁড়ায়। সন্তানকেও অনেক সময় বিড়ম্বনার মধ্যে পড়তে হয়। যেমন বাড়িতে কোনও অতিথি এলেই তার সামনে বাবা-মা বলে থাকেন 'আমার ছেলে খুব ভালো গান গাইতে পারে। বাবু সকলকে একটা গান শুনিয়ে দাও।' এই ধরনের ঘটনা জন্য অনেক সময়ই সন্তান প্রস্তুত থাকে না, বা অনেক সময় ভালো লাগে না। কিন্তু বাবা-মায়ের সামনে ইচ্ছে না থাকলেও তাকে কথা বলা পুতুলের মতো কাজ করে যেতে হয়। আবার অনেক সময়ে এই রকম পরিস্থিতি হয়, যে সন্তান সেই মুহূর্তে বাবা-মায়ের কথা না শুনলে বা কোনও কারণে জেদ করলে তারা বিরক্ত প্রকাশ করেন, তাও অতিথিদের সামনেই। এই ধরনের ঘটনার রাগের বহিঃপ্রকাশ আমরা বাবা-মায়ের মধ্যে হামেশাই দেখে থাকি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা এই ধরনের ঘটনার কোনও আমল দিই না। কিন্তু পরবর্তী ক্ষেত্রে দেখা যায়, এই পরিস্থিতি একজন অভিভাবকের সঙ্গে তার সন্তানের সম্পর্ককে খারাপ করে। সন্তানকে মানুষ করতে গিয়ে একজন অভিভাবককে কিছু জিনিস মাথায় রাখা দরকার। তার ইচ্ছে ও অনিচ্ছের মূল্য দেওয়া উচিত।

● বাবু একটা কবিতা বলে দেখাও তো

বাবা-মায়ের এই ধরনের আব্দার অনেক সময়েই শিশুদের বিচলিত করে দেয়। তবে অভিভাবকরা তাদের এই ধরনের নির্দেশ থেকে বিরত থাকেন না। কারণ এ ধরণের দাবির সামনে প্রথম দিকে সন্তান অভ্যস্ত থাকে না। প্রথমে অনুরোধের মত শোনালেও এ'টা ক্রমশ হুকুমের পর্যায় চলে যায় আর বেশিরভাগ সময়ই এতে কাজের কাজ কিছু হয় না। বাচ্চাদের গান গাইতে বা নাচতে হয়তো খারাপ লাগে না তবে তারা শুধুমাত্র তাদের পছন্দের লোকের সামনেই নাচতে বা গাইতে স্বচ্ছন্দবোধ করে (যেমন শুধু বাবা আর মায়ের সামনে)। বাড়ির বাইরের কারওর সামনে বা অপরিচিত কোনও মুখের সামনে অন্যের ইচ্ছে মতো নাচতে বা গাইতে তার আপত্তি থাকতেই পারে। অতএব তাকে জোর করলে হিতে বিপরীত হতে পারে। নিজের সন্তানকে আগেভাগে জিজ্ঞেস করে নিন যে সে অতিথিদের সামনে গাইতে বা অন্য কিছু করতে চায় কি না। তার ইচ্ছে থাকলে তবেই তাকে অতিথিদের সামনে গাইতে বা অন্য কিছু করে দেখাতে বলা উচিত।

● সম্পর্ক জোর করে গড়ে না তোলা

সংবাদমাধ্যমে আজকাল প্রায়শই শোনা যায় শিশু নিপীড়নের বেদনাদায়ক সমস্ত ঘটনা। তা সত্ত্বেও বাবা মায়েরা যে কেন বন্ধুবান্ধব বা প্রতিবেশীদের শিশুর আত্মীয়স্থানীয় করে তুলতে চান কে জানে। পরিবারের সদস্যদের বাইরে কার সঙ্গে শিশুর সখ্যতা বা আত্মীয়তা গড়ে উঠবে সে'টা শিশুকেই ঠিক করে নিতে দিন। আপনার শিশু কাকে আপন করে কাছে টেনে নিচ্ছে সেদিকেও অবশ্য আপনার কড়া নজর রাখা উচিত। আর আপনার সন্তান যদি কাউকে এড়িয়ে চলতে চায় বা ভয় পায় তাহলে জানতে চেষ্টা করুন ওর অনীহা বা ভয়ের কারণটা ঠিক কী। আপনার সন্তানের ওপর জোর না খাটিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করুন।

● সন্তানকে স্বাবলম্বী হতে দিন

সন্তান সব বাবা মায়েরই স্নেহের পাত্র, কিন্তু অনেক সময় আমরা আদর আর আস্কারার তফাতটা গুলিয়ে ফেলি। যেমন ধরুন খোকা বা খুকু বড় হওয়ার পরেও তার জন্য খাবার বেড়ে, তাকে খাইয়ে, তার পাত পরিষ্কার করা, এমনটা তো মাঝেমধ্যেই দেখা যায়। কিন্তু সন্তানকে আদরে রাখতে গিয়ে একটা বড় গোলমাল বাবা মায়েরা করে বসেন। যেমন এক্ষেত্রে যদি শিশু নিজের খাবার নিজে নিয়ে, খেয়ে, প্লেট ধুয়ে রাখতে পারে তাহলে তার মধ্যে তৈরি হবে আত্মবিশ্বাস। এমনি ভাবে শিশুরা বড় হলে ওরা জীবনযুদ্ধের জন্য ভালোভাবে প্রস্তুত হতে পারবে এবং তাদের পরমুখাপেক্ষী হয়ে কাটাতে হবে না।

● তুলনা করা বন্ধ করুন

অন্যের সঙ্গে তুলনা শৈশব থেকেই শুরু হয়ে যায়, এতে অস্বাভাবিক কিছু নেই। নবজাতকের ক্ষেত্রেও বাবা-মায়েরা তাদের ওজন, উচ্চতা বা তাদের বাড়বাড়ন্তের তুলনা আকছার করে থাকেন অন্য শিশুদের সঙ্গে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তুলনার পরিধি বাড়তে থাকে। শিশুর নিজস্ব গুণগুলো কিছুতেই যেন যথেষ্ট মনে হয় না। বাবা-মায়েরা সর্বক্ষণ শিশুর মঙ্গল কামনা করে চলেছেন, এ

নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই। কিন্তু এই ভাবে তুলনা চাপিয়ে দিয়ে শাসন করার আখেরে লাভ নাও হতে পারে। বরং পজিটিভ ভাবে তাকে সমস্ত কাজে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান করা উচিত।

● লোকে কী ভাববে? এই চিন্তায় আমাদের দেশের বাবা মায়েরা সর্বক্ষণ মশগুল। ছেলে হয়ে খেলনা গাড়ি পছন্দ করে না? সে কী! লোকে কী বলবে? এ বাবা!

মেয়ে হয়ে শর্ট পরতে ভালোবাসে? আরে লোকে কী বলবে?

যদি বছর দুয়েক বয়েসেই আমাদের বাচ্চাদের এই ধরনের অদ্ভুত প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়, তাহলে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অবস্থা আরও ভয়াবহ হয়ে উঠতে থাকে। লোকে কী ভাবল এই চিন্তার বোঝা বয়েই তার জীবন কেটে যাবে হয়তো।

● তোমার কোনটা ভালো সেটা আমিই ঠিক করে দেব

এতে মনে মনে শিশু ভাবতে শুরু করে যে সে খুব কম জানে এবং কম বোঝে। ছোট থেকেই আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা দেয়। ফলে বড় হয়েও সে নিজের সিদ্ধান্ত নিতে ভয় পায়। সর্বক্ষণ বাবা মায়ের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে যে কোনও সমস্যার মোকাবিলা করতেও পিছপা হবে। সবচেয়ে বড় কথা এই ধরনের শাসনে বড় হলে শিশুরা প্রশ্ন করতে ভুলে যায় এবং এতে তাদের চরিত্র দুর্বল হয়ে পড়তেই পারে।

● ছেলেমেয়ের মধ্যে তফাত না করা: অনেক সময় আমাদের দেশের বাবা-মায়েরা ছেলেমেয়েকে সমান প্রতিপন্ন করতে গিয়ে ছেলেমেয়ের তফাতটাকেই আরও প্রকট করে তুলে ধরেন। এর ফলে শিশুরা যখন বড় হয় তখন তারা ফেমিনিজমের মতো চিন্তাধারাকে সম্যকভাবে চিনতে পারে না। কাউকে মেয়ে বলে তার প্রতি দয়াদৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে, বা দুর্বল ভাবতে হবে এ ধরণের শিক্ষা না দিয়ে বরং শিশুকে শেখানো উচিত যে ছেলেমেয়ে দু'জনেই সমান।

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৭

ক্যুইজ

১) দীপন প্রাবল্যের একক কী?
২) বস্তুর তাপীয় অবস্থাকে কোন রাশি দিয়ে পরিমাপ করা হয়?
৩) জলীয় টান কী?
৪) রেফ্রিজারেটরে কোন তরল গ্যাস ব্যবহৃত হয়?
৫) তড়িৎচালক বলের একক কী?
৬) রোধ কী ধরনের রাশি?
৭) ডুয়ার্সের স্থানীয় নাম কী?

৮) পরীক্ষাগারে নাইট্রোজেন তৈরির শর্ত কী?
৯) অ্যাটাকামাইট কোন ধাতুর আকরিক?
১০) ফসজিনের রাসায়নিক নাম কী?
১১) হাইড্রোজেনের থেকে ভারী হওয়া সত্ত্বেও কোন গ্যাস বেলুনে ব্যবহার করা হয়?
১২) পর্যায় সারণীতে সবচেয়ে তড়িৎ ঋণাত্মক মৌল কোনটি?
১৩) বায়ুমণ্ডলে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের পরিমাণ শতকরা কত ভাগ?
১৪) ভারতের কোথায় ভারী জল তৈরি করা হয়?
১৫) সরলতম হাইড্রোকার্বনের নাম কী?
১৬) ক্লোরিন গ্যাসের গন্ধ কেমন?
১৭) কোন গ্যাসকে অক্সিজেনের বাহক বলা হয়?
১৮) ধুমায়মান নাইট্রিক অ্যাসিডের রং কী?
১৯) নাইট্রিক অ্যাসিডকে অনেকদিন রেখে দিলে কেমন রং হবে?
২০) লাফিং গ্যাস আসলে কী?
২১) সাদা কপার সালফেটে জল মেশালে কোন রং হবে?
২২) কোন পরীক্ষার সাহায্যে নাইট্রিক অ্যাসিড ও নাইট্রেট লবণ শনাক্ত করা হয়?
২৩) পটাশিয়াম ফেরোসায়ানাইড কী?
২৪) অক্সি-অ্যাসিটিলিন শিখার তাপমাত্রা কত?
২৫) হাইড্রোজেন শব্দের অর্থ কী?
২৬) হাইড্রোজেন গ্যাস উপাদনে কী ধরনের দস্তা ব্যবহার করা হয়?
২৭) মার্বেল পাথরের রাসায়নিক উপাদান কী?
২৮) কোনও বিক্রিয়ায় সদ্যমুক্ত হাইড্রোজেনকে কী বলে?
২৯) বায়ুর চেয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড কত গুণ ভারী?
৩০) গাইগার কাউন্টার কী কাজে লাগে?
৩১) কার্সিনোজেন কাকে বলে?
৩২) সমুদ্রের গভীরতা মাপতে কোন যন্ত্র ব্যবহৃত হয়?
৩৩) তেজস্ক্রিয়তা মাপার একক কী?
৩৪) রেড ডেটা বুক কী?
৩৫) বিজ্ঞানের কোন শাখার সঙ্গে ইকোথিয়োলজি যুক্ত?
৩৬) দ্বিপদ নামকরণের প্রবক্তা কে?
৩৭) হার্বেরিয়াম কী?
৩৮) যে লেন্সের প্রান্তভাগ মধ্যভাগের তুলনায় স্ফীত তাকে কী বলে?
৩৯) পশ্চিমবঙ্গের সংরক্ষণ তালিকা ভুক্ত দু'টি প্রাণীর নাম কী?
৪০) রজনগ্রন্থি আছে কোন উদ্ভিদে?

উত্তর: ১) ক্যান্ডেলা। ২) উষ্ণতা। ৩) জলের সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ। ৪) তরল অ্যামোনিয়া। ৫) ভোল্ট। ৬) স্কেলার রাশি। ৭) মোরং। ৮) সংস্পর্শ শর্ত ও তাপ ৯) তামা। ১০) কার্বনিল ক্লোরাইড। ১১) হিলিয়াম। ১২) ফ্লোরিন। ১৩) ০.৯৫%। ১৪) নাঙ্গাল ও নারোরা। ১৫) মিথেন। ১৬) ব্লিচিং পাউডারের মতো ঝাঁঝালো। ১৭) নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড। ১৮) বাদামি। ১৯) হলুদ। ২০) নাইট্রাস অক্সাইড। ২১) নীল। ২২) বলয় পরীক্ষা। ২৩) একধরনের জটিল লবণ। ২৪) ৩০০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। ২৫) জল উৎপাদক। ২৬) বাণিজ্যিক দস্তার ছিবড়া। ২৭) ক্যালসিয়াম কার্বনেট। ২৮) জায়মান হাইড্রোজেন। ২৯) প্রায় দেড়গুণ। ৩০) পদার্থের তেজস্ক্রিয়তা নিরূপণের কাজে। ৩১) ক্যানসার সৃষ্টিকারী পদার্থকে। ৩২) ফ্যাদোমিটার। ৩৩) কুরি। ৩৪) বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদগোষ্ঠীর নামের তালিকা। ৩৫) মাছ সম্পর্কিত। ৩৬) ক্যারোলাস লিনিয়াস। ৩৭) শুকনো উদ্ভিদের নমুনা সংরক্ষণকারী কেন্দ্র। ৩৮) অবতল লেন্স। ৩৯) বাঘ ও ধনেশ পাখি। ৪০) পাইন।

জেনারেল নলেজ

হকি

'চক দে ইন্ডিয়া' হয়তো আমরা অনেকেই দেখেছি, দেখে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েছি। সিনেমাটা তৈরি হয়েছিল ভারতীয় মহিলা দলের হকি খেলা নিয়ে। যখন ক্রিকেট বা ফুটবল নিয়ে চারিদিকে এত রমরমা তখন হকির কথা শুনলে আমরা যেন বিস্মৃত হয়েই থাকি। ভুলে যাই হকি টিমের অনুদানের কথা বা তাদেরও বিশ্বজয়ের কথা। মোটামুটি অনুমান করা হয় হকি খেলার উৎপত্তি গ্রিসে। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে গ্রিকরা হকিজাতীয় একটি খেলা খেলত। মাথার দিকে বাঁকানো লম্বা লাঠি দিয়ে একটি গোলাকার চুয়াক্স বস্তু নিয়ন্ত্রণের সেই খেলাই পরবর্তী সময়ে হকি হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদেরা এথেন্সের প্রাগৈতিহাসিক একটি স্থানের দেওয়ালে হকি সংক্রান্ত একটি খোদাইচিত্রও আবিষ্কার করেছেন। সেই খোদাইচিত্রে দেখা যাচ্ছে, দু'জন লোক আজকের হকিস্টিকের মতো দুটি লাঠি দিয়ে একটি বল নিয়ন্ত্রণের জন্য লড়ছে, অন্যরা আশপাশে দাঁড়িয়ে তাদের ওই লড়াই দেখছে। হকির প্রাচীন আইনকানুন যে বর্তমানের চেয়ে অনেকটাই ভিন্ন ছিল, এথেন্সের খোদাইচিত্রটি তারও একটা প্রমাণ বলে প্রত্নতত্ত্ববিদদের মত। প্রতি দলে এগারো জন খেলোয়াড় নিয়ে দুটি দলের মধ্যে সমতল ঘাসযুক্ত মাঠ ও কৃত্রিম টার্ফের উপর বাঁকানো স্টিক ও বলের সাহায্যে এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়। খেলার সময় প্রত্যেক দলের লক্ষ্য থাকে স্টিকের সাহায্যে বলকে চালিয়ে বিপক্ষের গোল সীমানায় প্রবেশ করিয়ে স্কোর করা। হকি খেলার মাঠ আয়তাকার এবং তার মাপ ১০০৬০ গজ। হকি খেলায় ব্যবহৃত বলের ওজন ও পরিধি যথাক্রমে ৫.৫ আউন্স ও ২৩.৫ সেমি।

পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশেই কমবেশি হকি খেলা হয়। ফুটবল বা ক্রিকেটের মতো এতটা জনপ্রিয় না হলেও হকির জনপ্রিয়তা মোটেও কম নয়। এই খেলাটি পৃথিবীর প্রাচীন খেলাগুলোর মধ্যে একটি। যেসব খেলায় বল আর লাঠি দুটিই ব্যবহৃত হয় তার মধ্যে হকিকেই সবচেয়ে প্রাচীন বলে মনে করা হয়। অনেকে মনে করেন, সভ্যতার একেবারে শুরুর দিক থেকেই মানুষ হকি খেলে আসছে। তবে অন্তত ৪০০০ বছর আগে যে এই খেলাটির প্রচলন ছিল সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেছে। খেলাটির নাম তখন অবশ্য হকি ছিল না। একে তখন বল আর লাঠির খেলা বলে ডাকা হত। রোম, স্কটল্যান্ড, মিসর, দক্ষিণ আমেরিকাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে একে অন্যান্য নামেও ডাকা হত। তবে খেলার মূল নিয়মকানুন ছিল মূলত একই এবং তা আজকের হকি থেকে বেশ আলাদাই ছিল বলা চলে।

এরপর সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে বিশৃঙ্খলভাবে প্রচুর হকি খেলা হত। সেসময় একেকটি দলে ১০০ জন করে খেলোয়াড় অংশ নিত। গ্রামবাসীরা খেলাটিকে প্রচণ্ড পৌরুষ ও গর্বের বলে মনে করত। ফলে খেলাটি সে সময় মূলত ভয়ংকর এক রূপ নিয়েছিল। ১৫ দিনেরও বেশি সময় ধরে চলত এই খেলা এবং অনেক খেলোয়াড়কে গুরুতর আহত হতে হত। একজন রেফারি থাকলেও তাঁর বিশেষ কোনও ক্ষমতা ছিল না। মূলত এর কিছুকাল পর থেকেই খেলাটিতে বেশকিছু নিয়মকানুন যুক্ত হতে থাকে। ১০০ জনের বদলে খেলোয়াড় সংখ্যা দাঁড়ায় ৩০-এ। খেলার মান বাড়ানোর জন্য রেফারির হাতে দেওয়া হয় বিশেষ ক্ষমতা। খেলাটিকে সভ্য করে তোলার জন্য ইংল্যান্ডের এটন কলেজ এতে যুক্ত করে বিশেষ কিছু রীতি। ১৮৭৫ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে দ্য হকি অ্যাসোসিয়েশন।

আইস হকি, স্ট্রিট হকি, ফিল্ড হকি প্রভৃতি অনেক ভাগ থাকলেও হকি বলতে মূলত ফিল্ড হকিকেই বোঝানো হয়। ফিল্ড হকি একটি দলগত ক্রীড়া। এই খেলায় প্রত্যেক দলের খেলোয়াড়েরা হকি স্টিক দিয়ে বলে

আঘাত করে, ঠেলে বা ছুড়ে বিপক্ষ দলের গোল পোস্টে প্রবেশ করিয়ে গোল করেন। এই খেলার সাধারণ নাম হকি। অনেক দেশেই ফিল্ড হকি পরিচিত হকি নামে। তবে যেসব দেশে আইস হকি বা স্ট্রিট হকির মতো অন্যান্য ধরনের হকিও খেলা হয়, সেখানে ফিল্ড হকি শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পুরুষ ও মহিলাদের জন্য একাধিক আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়ে থাকে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য অলিম্পিক গেমস, প্রতি চার বছর অন্তর আয়োজিত হকি বিশ্বকাপ, বার্ষিক হকি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ও জুনিয়র হকি বিশ্বকাপ।

ইন্টারন্যাশনাল হকি ফেডারেশন (এফআইএইচ) হকির আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রক সংস্থা। এই সংস্থা হকি বিশ্বকাপ ও মহিলা হকি বিশ্বকাপ আয়োজন করে থাকে। এফআইএইচ-এর অধীনস্থ হকি রুলস বোর্ড হকি খেলার নিয়মকানুন স্থির করে।

অনেক দেশেই সিনিয়র ও জুনিয়র হকি খেলোয়াড়দের জন্য ক্লাবস্তরে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যার বিচারে হকির স্থান বিশ্বে দ্বিতীয় (প্রথম স্থানে আছে ফুটবল) হলেও, হকি দর্শকদের মধ্যে খুব একটা জনপ্রিয় নয়। অল্প সংখ্যক খেলোয়াড়ই পূর্ণ সময়ের হকি খেলোয়াড় হিসেবে খেলে থাকেন। যেসব দেশে তীব্র শীতের জন্য আউটডোরে হকি খেলা সম্ভব নয়, সেই সব দেশে বেমরসুমে ইনডোরে হকি খেলা হয়। ইনডোর ফিল্ড হকি নামের খেলাটি সাধারণ ফিল্ড হকির তুলনায় একটু আলাদা।

আমাদের ভারতীয় হকির কথা বলতে গেলে মেজর ধ্যানচাঁদকে(১৯০৫-১৯৭৯) বাদ দিয়ে কোনও কথা বলা সম্ভব নয়। ধ্যানচাঁদকে সারা বিশ্বের মধ্যে সর্বকালের সেরা হকি খেলোয়াড় বলে মেনে নেওয়া হয়। তিনি বল এত ভালো নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন যে তাঁকে হকির জাদুকর বলা হত।

বিশ্ব হকির ইতিহাসে ভারতের যে কতটা অবদান, বা বিশ্বের খেলাধুলার ইতিহাসে ভারতের হকি খেলোয়াড়দের কতটা অবদান, সেটা কিন্তু সারা বিশ্ব সেটা খুবই ভালো বোঝে। তাই তো ২০১২ সালের লন্ডন অলিম্পিকের সময়ে অতীতের এবং বর্তমানের বিভিন্ন বিখ্যাত অলিম্পিকে যোগদানকারী খেলোয়াড়দের নামে লন্ডনের ৩৬১টি টিউব স্টেশনের আবার নামকরণ করা হয়। ৩৬১টি স্টেশনের মধ্যে ছয়টি নাম হয় হকি খেলোয়াড়দের নামে। আর তাদের মধ্যে তিনটে নাম হল ভারতের অলিম্পিকজয়ী সেরা তিন হকি খেলোয়াড়ের ধ্যানচাঁদ, রূপ সিং আর লেসলি ওয়াল্টার ক্লডিয়াস। তাই বলাই যায় হকির জন্য ভারত জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করতে পারে। এনিয়ে কোনও দ্বিধা নেই।

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৭

রিও-নিগো ও সলিমস

ব্রাজিলের রহস্য

সলিমস

রিও নিগো

ব্রাজিল পেলে-নেইমারের। ব্রাজিল শুধুমাত্র যে ফুটবলের বিস্ময়কর প্রতিভার জন্ম দিয়েছে, তা নয়। দক্ষিণ আমেরিকার দেশটির বৈচিত্রময় প্রকৃতির রূপও সবার নজর কাড়ে। বিখ্যাত অ্যামাজন বনটির বেশিরভাগ অংশ কিন্তু ব্রাজিলের মধ্যেই পড়েছে। অ্যামাজনের গহীনে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আদিবাসী, জংলি, অনেক রকম প্রজাতির জন্তুজানোয়ার ছাড়াও ঘন সবুজ বনটির সঙ্গে রহস্যময়তার মিশেল যে কোনও দুঃসাহসিক অভিযাত্রীকে হাতছানি দিয়ে ডাকবে।

রিও-নিগো এবং সলিমস, অ্যামাজনের নদীগুলোর দু'টি বৃহত্তম উপনদী। যা আসলেই কিছুটা বিস্ময়কর। কারণ, এই দু'টি উপনদীর জলের রং ভিন্ন আর প্রবাহিত হয়ে একই জায়গায় এসে মিলিত হয়েছে। আবার হয়ওনি। আসলে রিও-নিগো এবং সলিমস উপনদীর জল কখনোই মেশে না। খুব সহজেই আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায়। ঠিক যেমন ব্রাজিল-আর্জেনিনা নিয়ে উপনদী দুটোর মাঝেও বিশাল দ্বন্দ্ব কাজ করছে।

উত্তর ব্রাজিলের ম্যানাউস শহর থেকে প্রায় দশ কিলোমিটার দূরে, পেরুর সীমান্তের কাছাকাছি রিও-নিগো এবং সলিমসের মোহনা। এই মানাউস শহরেই কিন্তু বিশ্বকাপ ফুটবলের একটি ভেন্যু রয়েছে, অ্যামাজোনিয়া অ্যারেনা। অনেকে এই নদীর মোহনাকে 'Meeting of waters' বলে আখ্যায়িত করেন। উপনদী দুটোর ছবি দেখলে যে কেউ চমকে উঠবেন, মনে হবে যেন দুই রকমের কার্পেট বিছিয়ে রাখা হয়েছে।

হালকা রঙিন জলের উপনদীটি হল সলিমস। আন্দিজ পর্বত থেকে অ্যামাজনের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আসা জলের সঙ্গে পলি মাটি, কাদা, বালির মিশ্রণ এই উপনদীকে অনেকটা ফ্রেঞ্চ কফি Cafe au lait-এর মত রং উপহার দিয়েছে। একে 'সাদা জলের নদী' অথবা 'white water river'ও বলা হয়ে থাকে। প্রায় ৮০ কিলোমিটার চওড়া সলিমস ১৬০০ কিলোমিটার পর্যন্ত প্রসারিত।

ছবিতে গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন জলের নদীটি হল রিও-নিগো। প্রায় ২২৫৩ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের এই উপনদীর ৮৫০ মাইল ব্রাজিলের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে। এর কিছু অংশ আবার কলম্বিয়া ও ভেনেজুয়েলার মধ্যে আন্তর্জাতিক সীমান্ত হিসাবে কাজ করছে। অ্যামাজনের ভিতরে বয়ে চলা এই উপনদীর জলের সাথে দ্রবীভুত আর মিশ্রিত হওয়া পাতা, গুল্ম, লতাপাতা, উদ্ভিদের জন্যই এর রং কালো চায়ের লিকারের মতো। প্রায় ৮০০-৯০০ প্রজাতির মাছ এই উপনদীর বাসিন্দা।

অদ্ভুত হলেও সত্যি যে, রিও নিগোর জল কোনও রকম পলি মাটি বহন করে না। ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির ওয়েবসাইটের মতে, রিও নিগো হল বিশ্বের সবচেয়ে পরিষ্কার প্রাকৃতিক জলের নদীগুলোর মধ্যে অন্যতম। মেঘমুক্ত সূর্যস্নাত দিনে, রিও নিগো নদীর নিচে ৯ মিটারেরও বেশি দেখা যায়।

এবার জেনে নিই রিও-নিগো এবং সমিলসের এমন আচরণের কারণ—

এদের অমিশ্রিত থাকার কারণ হল, নদী দুটোর মধ্যে জলের তাপমাত্রা, প্রবাহমান জলের বেগ ও জলের ঘনত্বের তীব্র পার্থক্য। সলিমস হল রিও-নিগোর চাইতে দ্রুতগতির, বেশি ঘনত্বের ও অতিমাত্রায় ঠান্ডা জলের উপনদী। যা ২২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ঘণ্টায় ৪ থেকে ৬ কিলোমিটার বেগে বয়ে চলে। অন্যদিকে, উষ্ণতর ও তুলনামূলকভাবে মন্থর গতির রিও-নিগো বয়ে চলে ঘণ্টায় দুই কিলোমিটার এবং জলের তাপমাত্রা প্রায় সবসময়ই ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকে। এবং এই তারতম্যগুলোর জন্যই নদীগুলির জলের মিশ্রণ ভালোভাবে হতে পারে না। এই দুটি উপনদী পাশাপাশি প্রায় ৬ কিলোমিটারেরও বেশি জায়গা জুড়ে বয়ে চলে গঠন করেছে আমাদের গ্রহের বৃহত্তম নদী অ্যামাজন।